দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ও সনাতন ভারতীয় নীতি
— পৃঃ ১৫

বুদ্ধশিষ্যের স্মৃতিরক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ
— পৃঃ ২৩

৭০ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ৩০ এপ্রিল ২০১৮।। ১৬ বৈশাখ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

মোদীকে হঠাতে ষড়যন্ত্র

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ১৬ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৩০ এপ্রিল - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

চরম অসহিষ্ণুতা শাসকের মৃত্যুবাণ হতে চলেছে
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : নামেই সিংহ, বিড়াল-বিক্রমও নেই
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

বাস্তবে চাকরির কোনও ঘাটতি নেই ▯ জয়ন্ত সিন্‌হা ▯ ৮

দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে
▯ ড: নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

এত ষড়যন্ত্র শুধু মোদীকে হঠাতে ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১৩

ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ও সনাতন ভারতীয় নীতি
▯ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ ▯ ১৫

পঞ্চায়েতের পাঁচ কাহন ▯ দীপক কুমার ঘোষ ▯ ১৭

বুদ্ধশিষ্যের স্মৃতিরক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ
▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ২৩

ভ্রমণ : পাহাড়ের কোলে লাল ঝামেলা
▯ ব্রততী ঘোষ ▯ ২৬

মৃত্যুভয় থেকে নিষ্কৃতির জন্য ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

গল্প : মিল অমিল ▯ সিদ্ধার্থ সিংহ ▯ ৩৫

বাংলা কবিতায় বুদ্ধচর্চা : উৎস থেকে সাম্প্রতিক
▯ হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী ▯ ৪৩

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৪৬-৪৮

সাপ্তাহিক রাশিফল ▯ ৫০

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **রঙ্গম : ৪০** ▯ **বইপাড়ার খবর : ৪২**▯ **এইসময় ও সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **চিত্রকথা : ৪৯**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৭ই মে, '১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিচারপতির অপসারণ

প্রকাশিত হবে ৭ই মে, '১৮

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের অপসারণ দাবি করে উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর কাছে মহাঅভিযোগ জমা দেয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে কয়েকটি বিরোধী দল। যদিও উপরাষ্ট্রপতি সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। কিন্তু দেশের শতাব্দীপ্রাচীন দলটির এহেন নির্লজ্জ আচরণে স্তম্ভিত দেশ। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, কংগ্রেস এই দাবি করে আদালত এবং বিচারব্যবস্থার অবমাননা করেছে। সুখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ ফলি নরিম্যান বলেছেন, কংগ্রেসের এই দাবির দিনটি ভারতীয় বিচারব্যবস্থার অন্ধকারতম দিন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এবিষয়ে লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত প্রমুখ।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত হবে একটি বিশেষ রচনা। লিখবেন— শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

'ইমপিচমেন্ট' লইয়া কংগ্রেসের সংকীর্ণ রাজনীতি

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে 'ইমপিচমেন্ট' বা মহা-অভিযোগের প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করিয়া দিয়াছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। শুধুমাত্র 'ধারণা ও আশঙ্কার' ভিত্তিতে দেশের প্রধান বিচারপতির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের বিরুদ্ধে এহেন উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহাকে তিনি সংবিধান অবমাননার শামিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দ্রুততার সহিত এই প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব যে সংসদের দুই কক্ষে গৃহীত হইবে না তাহা প্রস্তাবকদের অজানা ছিল না। শুধু মাত্র রাজনৈতিক চর্চার বিষয় করিবার উদ্দেশ্যেই এমন করা হইয়াছে। আর একই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এই সময়ই 'সংবিধান বাঁচাও' অভিযোগের ডাক দিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টের চারজন বরিষ্ঠ বিচারপতি যেভাবে শীর্ষ আদালতের অভ্যন্তরীণ বিষয় প্রকাশ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাও এই মহা-অভিযোগ প্রস্তাবে যুক্ত করা হইয়াছে। যেভাবে বিরোধিতার যুক্তিগুলিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়াই শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে নিশানা করা হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতারই পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং ইহা এতটাই উৎকট যে, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক মানমর্যাদাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষা করা হইয়াছে। দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালিমালিপ্ত করা কংগ্রেসের পুরানো অভ্যাস। জরুরি অবস্থা জারি করিবার প্রসঙ্গটি ছাড়িয়া দিলেও ক্যাগ, রিজার্ভব্যাঙ্ক এবং নির্বাচন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও কংগ্রেস তোপ দাগিয়াছে। এইসব ভুলত্রুটি হইতে কিছুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস যদি নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা পরিত্যাগ করিত, তবে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করিত না। প্রস্তাবটি খারিজের বিরুদ্ধে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান শ্রী নাইডু তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কংগ্রেস অভিযোগ করিয়াছে। শ্রী নাইডু মহা-অভিযোগ প্রস্তাবটি খারিজ করিবার জন্য যে ২২টি কারণ দর্শাইয়াছেন, সেইগুলি একবার পড়িয়া দেখা দরকার বলিয়াও ভাবে নাই। প্রস্তাবটি খারিজের সঙ্গে সঙ্গে শ্রী নাইডু বিরোধী দলগুলিকে নিন্দা করিয়া তাহাদের সচেতনও করিয়া দিয়াছেন। প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইবার পর অর্ধ-সত্যের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের কোনও বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিবার আগে কংগ্রেস কমপক্ষে দশবার ভাবিবে। দলীয় ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য মহা-অভিযোগের মতো প্রস্তাব পেশ করিবার অনুমতি যে দেওয়া হইবে না—ইহা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ যোগ্য। জনস্বার্থ মামলা দায়ের করিবার মতো ইহা সহজ কাজ হিসাবে গণ্য করা যাইবে না। রাজ্যসভার সভাপতির এই প্রস্তাব খারিজের বিষয়টি এক নজির হিসাবে গণ্য হওয়া দরকার। কিন্তু এতসবের পরেও এই বিষয়ে কংগ্রেসের যে-কোনও জ্ঞানোদয় হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কেননা বিষয়টি লইয়া কংগ্রেস এখন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইতে চাহিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল প্রধান বিচারপতির আদালতেই বিষয়টি লইয়া কংগ্রেসকে মোকাবিলা করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং অর্হতি বাসহেতোঃ।।

উৎসাহী, আলস্যহীন, কাজ করার পদ্ধতি যিনি জানেন; নেশামুক্ত, বীর, কৃতজ্ঞ এবং যাঁর সৎজ্ঞানসম্পন্ন বন্ধু আছে তাঁর কাছেই লক্ষ্মী আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

চরম অসহিষ্ণুতা শাসকের মৃত্যুবাণ হতে চলেছে

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে থানা পুলিশ আদালত সবকিছুই চলছে। কারণ, এই রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্র না থাকলে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। চোখ বন্ধ করে এখনই বলে দেওয়া যায় যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ শান্তি পূর্ণ হবে না। হতে পারে না। সিপিএমের রাজত্বে নির্বাচনের নামে যে প্রহসন দেখতে রাজ্যবাসী অভ্যস্থ ছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি তৃণমূল রাজত্বে দেখতে হবে। বিরোধীরা যথেচ্ছ ধোলাই খাবে। কোন জেলায় কত লাশ পড়লো তার খতিয়ান খবরের কাগজে পড়ে পুলকিত হবে শাসকদলের ঠ্যাঙাড়েরা। বোমা হাতে অ্যাকশনে যাওয়ার আগে মদ মাংসের ঢালাও ব্যবস্থা থাকবে। বানের জলের মতো কাঁচা টাকা হুড়মুড় করে আসবে জমি মাফিয়া, বালি মাফিয়াদের কাছ থেকে। ভোট অবাধ নিরপেক্ষ হলো কিনা তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা থাকবে না। মদ মাংসের ভাগে কম না পড়লেই খুশি শাসকদলের সমাজসেবীরা আর তাদের মাথারা। মনে রাখবেন এই রাজ্যে গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে।

ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে গর্ব করার দিন দ্রুত শেষ হয়ে গেছে। আমরা সবাই সবকিছু দেখছি। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা হারিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নিতে অসুবিধাটা কোথায়? নীরবে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে শাসকদলের প্রার্থীদের ভোট না দিলেই দেখবেন যাদের বিষধর গোখরো মনে করেছিলেন তারা আদতে বিষহীন ঢোঁড়া সাপ। হিংসার জবাবে নীরব প্রতিবাদ। দুষ্কৃতীদের বুলেটের থেকেও শক্তিশালী ব্যালট। ইভিএম মেশিনের বোতাম। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, 'আমি রাজ্যের সমস্ত জেলা পরিষদকে বিরোধী শূন্য দেখতে চাই।' আপত্তিটা এখানেই। গণতন্ত্রে বিরোধী শূন্য জনপ্রতিনিধি সংগঠন হয় না। হিটলার, মুসোলিনীরা যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে বিরোধী শূন্য থাকাটাই নিয়ম ছিল। মমতা দিদি কি চল্লিশের দশকের সেই গণতন্ত্রের কথা বলছেন? নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গে এখন স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে জোর কদমে। রাজনৈতিক

গূঢ় পুরুষের

কলম

প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতা, নির্বাচনের ফলাফলে কারচুপি, নিজেদের সুবিধা মতো নির্বাচনী আইন বদলে নেওয়া, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি থেকে বুঝে নিতে হয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হয়েছে। তাই বলছি, নির্বাচন হলেই গণতান্ত্রিক অবাধ নিরপেক্ষ হবে তার কোনও মানে নেই। যেমন, গত বিশ বছর ধরে নিয়মমতো নির্বাচন হচ্ছে জর্জিয়া, রাশিয়া, পোল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, তুরস্ক এবং ইউক্রেন প্রভৃতি দেশে। সেইসব নির্বাচনে জনমত প্রতিফলিত হয় না। কারণ, দেশের স্বৈরাচারী শাসকরা অস্ত্র ও ক্ষমতার জোরে ভোট নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারছেন না। স্বৈরাচারী শাসনে সেটাই স্বাভাবিক। পুলিশ দলদাস। তাই থানায় অভিযোগ জানিয়ে লাভ নেই। রাজ্যের ভোটদাতাদের চোখ মেলে দেখতে হবে যে কথায় ও কাজে শাসকদল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বর্জন করছে কিনা। শাসকরা বিরোধীদের সঙ্গে কী রকম আচরণ করছে। শাসকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে কিনা। শাসকদল ভোটদাতাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে কিনা...ইত্যাদি। যদি মনে হয় যে ভোটের প্রচারের আড়ালে নীরব সন্ত্রাস চলছে তবে ব্যালটে বা ইভিএম মেশিনে জবাব দিন। রাজ্যে গণতন্ত্র রক্ষার দায় শুধুই বিরোধী দলের নয়। আপনার আমার মতো কোটি কোটি ভোটদাতাদেরও। সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে না। মোমবাতি হাতে মিছিল করতে হবে না। শাসকদলের গুণ্ডাদের সঙ্গে মারামারি করতে হবে না। প্রতিবাদে কণ্ঠ তুলতে হবে না। ছাপোষা মানুষ যা পারে আপনারা সেটাই করুন। সকালবেলা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ গণতন্ত্রকে ভোট দিন। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার এটাই একমাত্র পথ। অন্য দ্বিতীয় পথ নেই।

রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বশেষ যা পরিস্থিতি তাতে নিঃসন্দেহে শাসকদল অনেকটাই এগিয়ে আছে। কারণ, একমাত্র শাসকদলই পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরের সব আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক দল পারেনি। দিদি বলেছেন, 'ওদের লোক নেই। তাই প্রার্থী দিতে পারেনি।' এই কথা থেকে বোঝা যায় তাঁর মনোভাব কতটা স্বৈরাচারী। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আন্দোলনকে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, ওরা ৩৭ আর আমরা ২৩৭ (বিধায়ক)। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আমরা (সিপিএম) আন্দোলনকে রুখে দেব। পরবর্তীকালে দেখা গেছে বিধানসভার নির্বাচনে পাশার দান উল্টে গেছে। ভোটদাতারা নীরবে বামেদের প্রত্যাখান করেছেন। গণতন্ত্রে ভোটদাতারাই সর্বশক্তিমান। তাঁরাই গড়েন। তাঁরাই ভাঙেন। তাই ভোটদাতাদের কাছে আবেদন, গণতন্ত্রকে রক্ষা করুন। আপনার বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে ভোট দিন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর আরেকবার প্রমাণ করুন যে আপনারাই শেষ কথা বলেন।

নামেই সিংহ, বিড়াল-বিক্রমও নেই

অমরেন্দ্র কুমার সিংহ
নির্বাচন কমিশনার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন আয়োগ
১৮, সরোজিনী নাইডু সরণি
কলকাতা-১৭

স্যার,

মন খারাপ করবেন না প্লিজ। সবাই সিংহ হতে পারে না। কিন্তু আপনি সিংহের অভিনয় তো করতেই পারতেন।

আসলে স্যার, গত সপ্তাহখানেক ধরে মনটা খুব খারাপ। আশঙ্কা যে ছিল না, তা নয়। প্রথম থেকেই খুব মনে হচ্ছিল এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই বিচারপতিদের এজলাসেই গিয়ে জট পাকাবে। যে ভাবে দামাল ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল 'কিষেণজির' মতো মুখে কাপড় জড়িয়ে। তবু একটা আশা ছিল।

আশা ছিল নবান্নের দিকেই যখন আপনাকে তাকিয়ে থেকে সব কাজ সারতে হচ্ছে, তখন আপনি একটা অন্তত 'গুণ' আয়ত্ত্ব করে নিতে পারবেন গঙ্গাপারের নীল-সাদা বাড়ি থেকে।

কিন্তু সেটা করলেন না বলে আদালতে গিয়ে মুখে কালি মাখতে হলো। অথচ বাড়ির কাছেই গৃহশিক্ষকের কাছে গেলেন না। এই চিঠি আপনাকে যখন লিখছি তখনও পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

তবে বর্তমান থেকেই তো ভবিষ্যতের শিক্ষা নিতে হয়। আসলে স্যার আপনি যদি একটু 'স্বৈরাচারী' হতেন, তাহলেই দেখতেন খেলা একদম ঘুরে গেছে। না, না, এটা সবসময় খারাপ গুণ নয় স্যার। বুঝিয়ে বলছি আপনাকে।

আপনি হয়তো দেখার সময় পাননি, কিন্তু টিভিতে স্যার কী সুন্দর দেখায় জানেন। প্রশাসনিক বৈঠক দেখবেন। শুধু দেখবেন না, শিখবেন। প্রিন্সিপ্যাল দিদিমণি স্টেজে বসে থাকেন আর ছাত্র-ছাত্রীদের কী সুন্দর বকাঝকা করেন। হ্যাঁ স্যার, সুন্দরই লাগে। একে একে উঠে দাঁড়ায় সবাই। তারপর 'পড়া না পারলেই' ঝাড়। দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। কেউ ছাড় পায় না স্যার। আপনার সতীর্থরাও না, প্রিন্সিপ্যালের সতীর্থরাও না। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো একজনই কাঁপিয়ে দেয়

সবাক বুক।

ওইরকম একটু হলেই স্যার জমে যেত এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনটা। আরে জানি স্যার, ওই ১৯৯৪ সালে একটা আইন করে আপনার পা বেঁধে দিয়েছে ওরা। পালা বদল হলেও, ওতেই সুবিধা দেখে আর আইন পাল্টায়নি কেউ। জানেন তো স্যার, "যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।"

কিন্তু সেটা তো শুধু নির্বাচনের দিন ঘোষণাটুকু। তারপরে তো স্যার আপনিই সব। পঞ্চায়েত নির্বাচন আইনের ৪২ নম্বর ধারাটাই খতরনাক। তার পরে মনোনয়ন, নির্বাচন, ফলাফল পর্যন্ত আপনার হাতেই সব। হ্যাঁ লোকলস্করের জন্য নবান্নের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় বটে। তা বলে 'পোষ মানা' অফিসার হয়ে নাম খারাপ করলেন কেন?

সাহস করে একটু যদি স্বৈরাচারী হয়ে উঠে লাঠি ঘোরাতে শুরু করতেন, দেখতেন চুপসে যেত সব। আইন-আদালত সব আপনার দিকে থাকত। এমনকী, জনগণও স্যার আপনার সঙ্গেই থাকত। দার্শনিকরাও বলেছেন, যখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, যখন দেখছেন আপনার লোকলস্কর আপনার কথা শুনবে না, তখনই এই ধরনের নেতৃত্ব দিতে হয় স্যার। 'ডোন্ট কেয়ার' একটা মনোভাব নিয়ে এগিয়ে গেলেই দেখতেন সব লাইনে চলে আসত।

মীরাদেবীকে না মনে থাক, শেসন সাহেবকে তো মনে রাখতে পারতেন স্যার। তা না করে আপনি একটা নোটিশ লটকে দিয়েও পরেরদিন তা ছিঁড়ে দিলেন স্যার। রাগ করবেন না প্লিজ, আপনি আহম্মকের মতো কাজ করছেন স্যার।

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। আদালতেও মুখ পুড়ল। সেখানেও তো আপনাকেই বকলমে হেনস্থা হতে হলো। রাস্তা-ঘাটে-বাসে সে কী হাসাহাসি স্যার। ভালো লাগে বলুন? কোথায় ভাবলাম এই একমাসে একটা রিয়েল টি-২০ ম্যাচ দেখব। এমন হতাশ করলেন না স্যার। টেস্ট ম্যাচেও এমন বোর হইনি কখনও।

শুধু যদি গঙ্গাপার থেকে একটা 'গুণ' নিয়ে আসতেন স্যার, লোকে আপনাকে মাথায় তুলে নাচত। এরকম সুযোগ কি রোজ রোজ আসে স্যার! আমাদের কথা একটি বারও ভাবলেন না!

—**সুন্দর মৌলিক**

বাস্তবে চাকরির কোনও ঘাটতি নেই

অতিথি কলম

জয়ন্ত সিনহা

একটা খুব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাহিনি বাজারে ইদানিং খুব চলছে— চাকরিগুলো সব কোথায় হারিয়ে গেল? সত্যিটা কিন্তু একদম অন্য— সেটা হচ্ছে চাকরি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলো কোথায় গেল? আমাদের ভারতে যে নিত্য নতুন ক্ষেত্রে চাকরির সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলির দ্রুত নথিভুক্ত করে নির্ভুলভাবে পরিসংখ্যান পরিমাপক উৎসে (Data Processing Centere) পাঠাবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এখনও নেই। নীতি আয়োগ নিযুক্ত 'Task Force for Improving Employment Data' দেশের চাকরি ক্ষেত্রের বিভিন্ন ডাটা সেন্টারে নির্ভুলভাবে পরিসংখ্যান তৈরিতে যে যে সমস্যা রয়েছে সেগুলিকে নির্মূল করার চেষ্টা করছে। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্তি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পাওয়া যাবে, কেননা ওই সময় নীতি আয়োগের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগৃহীত চাকরি সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রকাশিত হবে।

তাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ওই সমীক্ষার ফলাফল পাচ্ছি, অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে কী ধরনের চাকরি তৈরি হয়েছে তা জানতে অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য ডাটাগুলিকে জড়ো করব। এই সংগৃহীত তথ্য থেকে একটা প্যাটার্ন বা ছবি ফুটে উঠবে, যেটা কোনও ডাটা ছাড়াই ইচ্ছে মতো গল্প ছেড়ে দেওয়ার থেকে অন্তত অনেক স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হবে। বোঝা যাবে অর্থনীতি ক্ষেত্রে কী ঘটছে। আরও একটা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে তা হলো, কোনও গল্পের শিকার হয়ে না পড়ার বিষয়টা।

প্রতিদিনই আমাদের অনেককে তরুণ ছাত্র-ছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের মুখোমুখি হতে হয় যারা অনেক সময়ই কী করলে সহজে চাকরি পাওয়া যেতে পারে এ সম্পর্কে পরামর্শ চান। সন্দেহ নেই চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষজন সাহায্য চাইতেই পারে, কিন্তু এই রকম কতজন চাকরি খোঁজার চেষ্টা করছে তার ওপর অনুমান করে চাকরি ক্ষেত্রে অবস্থা নির্ধারণ করাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। আজ সারা বিশ্বেই চাকরি ক্ষেত্রে এক বিরাট ও অপরিহারযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। চাকরি প্রার্থীরা চিরাচরিত দীর্ঘমেয়াদীভাবে আটকে থাকা চাকরিক্ষেত্রের থেকে অনেক বেশি নিজের ইচ্ছাধীন ও প্রয়োজনভিত্তিক তাৎক্ষণিক নিযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে যে সেক্টরে চাকরি করা হবে, সেই ক্ষেত্র বা বিষয়ের ওপর প্রচুর পড়াশোনা, যথাযথ knowledge থাকা দরকার হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই জ্ঞানের পরিধি নিত্য বর্ধমান। কালকের জানাটা আজ অকেজো হয়ে পড়ছে, ফলে চাকরির সারা জীবনই skill development এর একটা প্রক্রিয়া চলছে। এই ধারা চালু হওয়ায় ভারতে চাকরি ক্ষেত্রের ওপরও এর একটা প্রভাব পড়েছে। আমাদের প্রতি বছর যে ১ থেকে সওয়া কোটি তরুণ-তরুণী চাকরির বাজারে আসছে তাদের জন্য সরকারকে অতি দ্রুত গতিতে উচ্চমানের চাকরি তৈরি করতেই হবে, এতে কোনও দ্বিমত নেই। এই প্রসঙ্গে ইউপিএ সরকারের আমলে গঠিত একটি সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটি রিপোর্টের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য যেখানে বলা হয়েছিল তারা চাকরি তৈরির ক্ষেত্রে এই সরকারের (ইউপিএ) চাকরিহীন বৃদ্ধির পর্যালোচনাই করেছে। একইভাবে ২০১৪ সালে দেওয়া বিশ্বব্যাঙ্কের একটি প্রতিবেদনে বলা হয় ইউপিএ-২ সরকার মেয়াদ শেষ করাকালীন চাকরির অনুপাত ২০০৪ সালের ৫৭.৯ শতাংশ থেকে কমে ৫১.৭ শতাংশে এসে দাঁড়ায়।

সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটি গভীর গাড্ডায় পড়া অর্থনীতি যেখানে চাকরির হাল ছিল মর্মান্তিকভাবে খারাপ, সেখান থেকে মোদী সরকার চাকরির বাজারকে অত্যন্ত সদর্থক ও আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির দিকে মোড় ঘুরিয়েছে। প্রত্যেকটি সরকারের কাছেই চাকরি সৃষ্টি করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে স্থির থাকার ফল হিসেবে বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যাপক চাকরির সৃষ্টি হচ্ছে। খুব বেশি পিছিয়ে নেই সরকারি ক্ষেত্রও। এরপর ব্যক্তিগত ক্ষেত্র (personal sector) সেখানে ভালো কাজ তৈরি হচ্ছে। বাস্তবে চাকরি ক্ষেত্রটি আগের চেয়ে অনেক বেশি সেই অর্থে formal হয়ে উঠেছে। আগের informal sector যেখানে কাজ করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধের কোনও বালাই ছিল না, বর্তমানে সেখানে শ্রমিকদের অনেক বেশি সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে বেসরকারি ক্ষেত্র। সাম্প্রতিক দুটি রিপোর্ট অনুযায়ী বেসরকারি ক্ষেত্রে বড়-সড় নিযুক্তি ঘটেছে। জানুয়ারি ২০১৮-এর আন্তর্জাতিক ন্যাসকমের রিপোর্ট চারটি কোর সেক্টরে চাকরি তৈরির নথিভুক্তিকরণ করেছে। এগুলি হলো অটোমোবাইল, তথ্যপ্রযুক্তি খুচরো ও বস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্র। তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ থেকে ২০১৭ এই সময়সীমায় কেবল এই চারটি ক্ষেত্রেই ১ কোটি ৪ লক্ষ লোকের নতুন চাকরি হয়েছে। এর মধ্যে শুধু রিটেল ক্ষেত্রেই হয়েছে ৬৫ লক্ষ চাকরি। ন্যাসকম-এর মতই KPMG নামের একটি পরিচিত সংস্থা ভ্রমণ পর্যটন ক্ষেত্রের ওপর সমীক্ষা চালায়। তাদের ফলাফলে পর্যটন ক্ষেত্রে বাৎসরিক ১৬ শতাংশ গড় বৃদ্ধি ঘটেছে, এর ফলে প্রতি বছর ৩০ থেকে ৪০ লাখ নতুন চাকরির সংস্থান হয়েছে। নতুন নতুন ক্ষেত্র যেমন---ই-কমার্স বিমান পরিবহণ, মবিলিটি সার্ভিস, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রগুলি চিরাচরিত চাকরি পরিসংখ্যানের সঙ্গে আগে যুক্ত ছিল না সেখানে বহু চাকরির সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে সর্বাধুনিক

Naukri Job Speak Index যারা গোটা চাকরির ক্ষেত্রের ওপর সমীক্ষা চালায়, তাদের হিসেব অনুযায়ী সংগঠিত বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রতি মাসে বিগত বছরের সঙ্গে তুলনায় ১০-১৬ শতাংশ বাড়তি চাকরি হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে বড় অগ্রগতি বলেই গণ্য হবে। অন্যদিকে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ আসায় সরকারি ক্ষেত্রও চাকরি তৈরিতে পিছিয়ে নেই। রাস্তা তৈরি থেকে, রেললাইন পাতা, (সিগন্যালিং, লাইন মেরামত, তদারকি ব্যবস্থা), গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ থেকে ডিজিটাল যোগাযোগ সবগুলি পরিকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রেই এই সরকারের আমলে ব্যাপক বৃদ্ধি শুরু হয়েছে। ২০১১-২০১৪ এর মধ্যে ১২০০০ কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছিল। ২০১৪-১৭ এই তিন বছরে সেই পরিমাণে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে ১৮৭০২ কিমি।

২০০৯-১৪ সালে গড়ে ৩৪৫ কিমি রেল লাইন বসানো হয়েছিল। সেই গড় ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের শুরুর মধ্যেই প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৬৩৩ কিমি হয়েছে। অন্যদিকে ২০১১-১৪ সময়ে ৩৫৮ কিমি ব্রডব্যাণ্ড পরিষেবা চালু হয়েছিল, সেই পরিসংখ্যানই ২০১৪-১৭ সালে ২.৩ লক্ষ কিলোমিটারের অবিশ্বাস্য বৃদ্ধিতে এসে পৌঁছেছে। চালু বিমানবন্দরের সংখ্যা ৭৪ থেকে ১০০ হয়েছে। বিমান বন্দর নির্মাণের গতিতে নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এই যে বিশাল বৃদ্ধির কিছুটা ঝলক এখানে পরিসংখ্যান সহকারে উপস্থাপন করা হলো, তা থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, অর্থনীতির এই মহাগুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে চাকরি বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনও বলা যায় যে, চাকরির বৃদ্ধিতে সব ক্ষেত্রকে কিন্তু ছাড়িয়ে গেছে 'ব্যক্তিগত ক্ষেত্র'। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাবে অনুযায়ী ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যের নিরিখে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্যোগপতি বা যাই বলা হোক না কেন, তাঁরা ভারতের অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নিয়েছিল। এই ক্ষেত্রে মুদ্রা যোজনা একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। আজকের তারিখে সাড়ে এগারো কোটি মানুষ বাড়তি সম্পদ ছাড়াই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়েছেন। সবচেয়ে উৎসাহব্যাঞ্জক বিষয়, এঁদের মধ্যে ৮ কোটি মহিলা উদ্যোগপতি রয়েছেন। যাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও নিজের ব্যবসায় নিযুক্ত করেছেন।

চারদিকে একটু নজর ফেরালেই দেখা যাবে, নতুন উদ্যোগপতি তার ব্যবসায়িক উদ্যোগের সূচনা করল তার সহকারী হিসাবে এবং অধিকাংশ উদ্যোগেই হাতে-কলমে কাজ করার (তা সে যে ধরনেরই হোক) কাউকে না কাউকে লাগবেই। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১ থেকে ২ জন লোক ন্যুনতম ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েছে। সকলেই জানেন, একটি মণিহারি দোকানে একজন লাগবেই, একটি বিউটি পার্লারের সূচনায় একাধিক লোক লাগতে পারে। একটি মফঃস্বলের কাপড়ের দোকানে একজন দরজি আবশ্যক। ফার্নিচারের দোকান খুললে ছুতোর ছাড়া চলবেই না।

> "বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাবে অনুযায়ী ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যের নিরিখে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্যোগপতি বা যাই বলা হোক না কেন, তাঁরা ভারতের অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নিয়েছিল। এই ক্ষেত্রে মুদ্রা যোজনা একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে।"

ওপরের উদাহরণ দেখে এটা মনে করা ভুল হবে যে, মোদী সরকার যেনতেন ভাবে একটা রোজগারের রাস্তা খোলাতে চাইছেন। সেটা ঠিক হলেও সরকার সব সময়ই যে পরিমাণের ওপর জোর দিচ্ছে তা নয়। চাকরির গুণগত মানের ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। বিমুদ্রীকরণ ও জিএসটি চালু হওয়ার পর একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। অর্থনীতি অনেক স্বচ্ছ হওয়ায় কর্মীর মাইনে থেকে যে কোনও সামাজিক নিরাপত্তাজনিত নিয়োগকর্তার খরচ সরকারি ব্যাঙ্ক খাতায় জমা পড়া বাধ্যতামূলক। তাদের পিএফ ও অন্যান্য ন্যায্য সুবিধা প্রদান অনেক বেড়ে গেছে। অতি সম্প্রতি ঘোষ অ্যান্ড ঘোষের পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর ৭০ লক্ষ নতুন চাকরি তৈরি হচ্ছে। উল্লেখিত, বিভিন্ন সূত্রের তথ্যগুলি নজর করলে দেখা যাবে, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই চাকরি তৈরি হয়েই চলেছে। আমাদের এই সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহ কিন্তু তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। তবে আগে চলা নীতি আয়োগকৃত ত্রৈমাসিক চাকরির সমীক্ষার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান শীঘ্রই সূচীতে এলে এই সমস্যার ইতি ঘটবে। কিন্তু এটা নির্বাচনের মরশুম পড়ে যাচ্ছে। মানুষকে অতি সাবধান হতে হবে, কেননা, ইত্যবসরে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে তথাকথিত 'ফেক নিউজ'-এ বাজার ছেয়ে যেতে পারে। সাধু সাবধান! ▮

কংগ্রেস দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চাইছে, তোপ অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৩ এপ্রিল রাজধানীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। রাহুল গান্ধীর 'গণতন্ত্র বাঁচাও' কর্মসূচির আসল লক্ষ্য রাজতন্ত্র বাঁচানো বলেও এদিন মন্তব্য করেন শাহ। তিনি অভিযোগ করেন বিরোধী দলের 'মোদীকে ঘৃণা কর' নীতি ক্রমশ 'ভারতকে ঘৃণা কর'-তে রূপান্তরিত হচ্ছে। সম্প্রতি দেশের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেস। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতিকে দিয়ে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নাটক করেও যখন কোনও লাভ হলো না তখন তাঁকে বহিষ্কার করতে চেয়ে ইমপিচমেন্টের ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে টেনে এনে কংগ্রেস দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চাইছে বলে তোপ দাগেন অমিত শাহ। তিনি অভিযোগ করেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সময়ে সময়ে তাঁদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত পড়লেই সেন্ট্রাল অডিটর জেনারেল বা ক্যাগ, নির্বাচন কমিশন, বৈদ্যুতিন ভোট যন্ত্র, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলির ওপর আঘাত হেনেছে। এর ফলে বিপন্ন হয়েছে দেশের গণতন্ত্র। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় দেশের গণতান্ত্রিক বিভিন্ন কাঠামোর ওপর কংগ্রেসের এই আঘাত নীতি সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

উবাচ

"আমরা প্রায়ই সংবাদমাধ্যম এটা করেছে ওটা করেছে বলে থাকি। এটা সংবাদমাধ্যমের কোনও ভুল নয়। আমরা প্রায়ই ভুল করি যা সংবাদমাধ্যমের মশলা হিসেবে কাজ করে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

রবিবারে (২২.৪.১৮) অ্যাপে।

"আর এস এস কোনও স্বীকৃত সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয় যে এর সঙ্গে জড়িতদের গায়ে অনায়াসে সাম্প্রদায়িক তকমা বসিয়ে দেবেন।"

কে রবীন্দ্র রেড্ডি
এন আই এ মামলার বিশেষ বিচারপতি

মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ মামলার রায় দান প্রসঙ্গে।

"স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা পাচ্ছিলাম। অসম্মানিত হয়েছি। তাই আর থাকব না।"

শাঁওলি মিত্র
বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব

বাংলা আকাদেমির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের পর।

"দলের সভাপতি অমিত শাহ চাইলে আমি সিদ্ধারামাইয়ার বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে রাজি আছি। আমার বিশ্বাস বাদামি বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ সিদ্ধারামাইয়াকে পরাজিত করবেন।"

বি এস ইয়েদুরাপ্পা
কর্ণাটকের বিজেপি নেতা

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে।

"এটি ভয়ংকরভাবে একটি কালো দিন। দেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এটিই সম্ভবত সবচেয়ে কালো দিন।"

ফলি নরিম্যান
বিশিষ্ট আইনজীবী

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ইমপিচমেন্ট আনার বিরোধিতা করে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যে 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছিল, তার পেছনে কিছু হিন্দুত্ববাদী সংস্থার মস্তিষ্ক ছিল বলে কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী মনে করেন। কিন্তু এটা ইতিহাসের এক জঘন্য ও বীভৎস বিকৃতি। এর ফলে, অনেক আগেই স্যার সৈয়দ আমেদ, রহমৎ আলী, কবি ইকবাল ও মুসলিম লিগের নেতারা এই তত্ত্ব স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে উদ্ভাবন করেছিলেন। আর ১৯৪০ থেকে লিগ নেতা এম. এ. আলি জিন্না তার বহুল প্রচারের মাধ্যমে দেশবিভাগকে ত্বরান্বিত করেছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জিন্না সৈয়দ আমেদ, ইকবাল প্রমুখ মুসলমান চিন্তাবিদদের রাজনৈতিক তত্ত্বের বাস্তুকার (ডঃ পুলক নারায়ণ ধর—'দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রথম উদ্গাতা স্যার সৈয়দ আমেদ খান'— সুখবর, ৬.৪.১৭)।

সকলেই জানেন যে প্রথম দিকে এই দেশের মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারেননি— কারণ তাঁদের রাজত্বকে উৎখাত করেই ইংরেজরা প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। এই কারণে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়, তখন তাঁদের ইংরেজ-বিদ্বেষ বস্তুত ইংরেজি বিদ্বেষে পরিণত হয়। তাঁরা আরবি-ফারসি নিয়েই থেকেছেন, কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় প্রমুখ মনীষীর উদ্যোগে হিন্দুরা অতি উৎসাহে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দেবে— সন্ধান দেবে আধুনিকতার। তার ফলেই কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় কর্মজগৎ ও শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত পিছিয়ে পড়েছে, সরে গেছে মূল স্রোত থেকে।

সৈয়দ আমেদ (১৮১৭-৯৮) বুঝেছিলেন যে, ইতিমধ্যে তাঁর সম্প্রদায় অনেকটাই শিক্ষাগত দিক থেকে সরে গেছে। তাই তিনি চেয়েছেন নতুন ব্যবস্থা। তিনি ইংরেজি শিক্ষা প্রসার ও মোল্লাতন্ত্রের বহু-বিবাহ, তালাক, বোর্খা ইত্যাদি তুলে দিয়ে তাঁর সমাজকে আধুনিক করতে চেয়েছেন। ক্রমে তাঁর সঙ্গে গোঁড়া মুসলমানের দূরত্ব বেড়েছে। তিনি তাঁর ভাবনা-চিন্তার প্রসারের জন্য আলিগড়ে ১৮৬৪ সালে 'সাইন্টিফিক সোসাইটি' গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু সহায়তা পেয়েছেন বহু হিন্দু-ইংরেজের কাছ থেকে। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজে শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিকতার প্রবর্তন। তার জন্য তিনি 'অ্যাংলো- ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেছেন যেটা পরে 'আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি'তে রূপান্তরিত হয় ১৯২০ সালে।

তাঁর সম্প্রদায়ের স্বার্থেই তিনি ইংরেজদের সহযোগিতা চেয়েছেন, বিলেতেও গিয়েছেন। 'স্যার' উপাধিও তিনি পেয়েছেন। জওহরলাল নেহরু লিখেছেন, ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর চিন্তাধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে—দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৪৫। তখনও তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী প্রচারক, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ মানসিকতা তাঁর মধ্যে আসেনি। কিন্তু ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের আবির্ভাব ও ক্রমে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি তাঁকে একেবারে উল্টোদিকে নিয়ে গেছে। তখন তাঁর মনে হয়েছে কংগ্রেসের মাধ্যমে এই দেশে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, মুসলমানরা হবে বঞ্চিত, অবহেলিত ও অত্যাচারিত। ১৮৮৬ সালের ১৬ মার্চ একটা ভাষণে তিনি 'two nations—Mohamadans and Hindus' কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন। এভাবেই এসেছে 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব'।

চন্দ্র-ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, 'He told his followers that if the British withdraw, the Hindu majority would dominate over and be unfair to the Muslim minority. He advised the Muslims not to join the Congress' (ফ্রিডম স্ট্রাগ্‌ল্, পৃ: ৯০৩)। অবশ্য তাঁদের মতে, তাঁর পেছনে ছিল ব্রিটিশ সরকারের জঘন্য বিভেদনীতি—'The British also pulled the strings behind the scene।'

এই ব্যাপারে কবি মহম্মদ ইক্‌বালেরও (১৮৭৩-১৯৩৮) একটা বড় ভূমিকা ছিল। প্রথম দিকে তিনি উদারপন্থী থাকলেও ক্রমে তিনিও সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় নিয়েছেন। বিপন্ন ইসলামকে রক্ষা করাই তখন তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। ডঃ সরল কুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ১৯৩০ সালে মুসলিম লিগের অধিবেশনে তিনি পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে একটা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান। তাঁর মতে, এটাই হবে ভারতবর্ষের মুসলিমদের চূড়ান্ত নিয়তি ('final destiny')। তাঁর দাবি ছিল মুসলিমদের জন্য একটা পৃথক রাষ্ট্র তৈরি করতেই হবে। অনুরূপভাবে কেম্ব্রিজের ছাত্র রহমত আলির নেতৃত্বে, কিছু ছাত্র ১৯৩৩ সালে 'নাউ অর নেভার' পুস্তিকার মাধ্যমে জানায় যে, ভারতে একটা জাতিই বাস করে না—মুসলমানরা পৃথক একটা জাতি। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে বিভক্ত করে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তাঁদের জন্য তৈরি করতেই হবে (ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পৃ: ৪৪৮)।

তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই ধরনের দাবি মুসলিম লিগই তুলেছিল ১৯০৬ সালে। আগা খাঁ-র নেতৃত্বে একটা মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র তৈরির দাবি জানিয়েছে। আর সেই বছরই সলিমুল্লার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে 'মুসলিম লিগ'। প্রকাশ্যে এই দল দ্বি-জাতি তত্ত্বের কথা না বললেও তার দাবির মধ্যে এটা কিন্তু উহ্য ছিল। এর উদ্দেশ্যে

ছিল---(১) সরকারের প্রতি আনুগত্য জানানো : (২) মুসলমানদের পৃথক স্বার্থকে রক্ষা করা, এবং (৩) অস্পৃশ্যদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি না করেও ওই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা—(ড. নিমাই সাধন বসু—দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ: ৭৭)। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'The Muslim League finaly adhered to the policy of separation।' তবে তখনও লিগ নেতারা ভাবতে পারেননি যে, তাঁদের প্রস্তাবিত 'হোমল্যান্ড' সত্যিই পাওয়া যাবে। ১৯৩৩ সালে তাঁরা রহমত আলি ও তাঁর সঙ্গীদের দাবিকে 'student's dream' বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে, সেটা ' impracticable'। কিন্তু ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন হয়, তার ফলাফল দ্রুত গতিতে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে দেশবিভাগের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এই নির্বাচন লিগকেও পুরোপুরি হতাশ করে দিয়েছিল। কংগ্রেস ছয়টা (পরে আরও দুটো) রাজ্যে গরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে। সারা দেশে মুসলিম আসন ছিল ৪৮২টা---তার অল্পই লিগ পেয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছিল মুসলমান গরিষ্ঠতা—কিন্তু সেখানেও কংগ্রেস প্রচুর আসন পেয়েছে। পঞ্জাবে হিউনম্যানিস্ট দল ১৭৫টার মধ্যে ১০৬টা দখল করেছে। এই দলে অনেক মুসলমান থাকলেও লিগ এখানে সুবিধে করতে পারেনি। বাংলায় তাঁদের তিনটে দল ছিল— লিগ পেয়েছিল ৪০টা আসন, স্বতন্ত্রদের ছিল ৪১টা, আর ফজলুল হকের দলের ৩৫টা---(ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য--- 'ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস', পৃ: ২১৩)।

এই বিরাট হতাশা লিগকে আবার উগ্র সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। লিগ নেতারা দেশব্যাপী প্রচার শুরু করেছেন যে, কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলোতে তাঁদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়েছে—এই অবস্থায় দেশত্যাগ ছাড়া উপায় নেই। লিগ-নেতা জিন্না এবার স্পষ্ট করেই 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশকে দ্বি-খণ্ডিত করার দাবি তুলেছেন—'M. A. Jinnah luanched campaign for two nation theory and blamed the Congress for discrimination against muslims which, however, he could not prove'—(ড. পি. এন. চোপ্‌রা—'ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগ্‌ল্ ফর ফ্রিডম, পৃ: ৫১)। কংগ্রেস অবশ্য এই ব্যাপারে দেশের প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছে—কিন্তু সেটা লিগ গ্রহণ করে নি।

১৯৪০ সালে লিগ লাহোর-অধিবেশনে স্পষ্ট করেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের কথা তুলে 'পাকিস্তান' দাবি করেছে। সেখানে জিন্না বলেছেন, মুসলিমরা অবশ্যই পেতে পারে 'their homeland their territory and their state' (ডঃ এস. এন. সেন—হিস্ট্রি অফ ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পৃ: ২৮২)। জিন্নার মতে, জাতি-সম্পর্কিত যে-কোনও সংজ্ঞায় মুসলমানরা একটা জাতি। সুতরাং তাঁরা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকারী। এর জন্য শ্লোগান উঠল—'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। ব্রিটিশ শাসকরা এতে মদত দিয়েছে তাদের। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির দ্বারা।

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, ধর্মকে একমাত্র জাতি গঠনের উপাদান মনে করা হলে 'জাতি' সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও বাস্তব সত্যকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করা হবে। সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা ছড়িয়ে আছেন—সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—তাঁরা সবাই একটা রাষ্ট্রের অধীন হবে না কেন?' জাতি গঠনের সব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে শুধু ধর্মকে প্রাধান্য দিলে আরও বিরাট প্রশ্ন উঠবে। তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভাষার ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালে পূর্ব বাংলা পৃথক রাষ্ট্র হল কেন—ধর্ম তো একই ছিল। সুতরাং বলা চলে—একটা অবাস্তব ও অচল ধারণা নিয়ে পূর্বোক্ত নেতা ও প্রচারকরা দ্বি-জাতি তত্ত্ব অধিকার করেছিলেন। এর পেছনে ছিল মানসিক সঙ্কীর্ণতা।

ডঃ এস. এন. সেন মন্তব্য করেছেন, প্রস্তাবটা ছিল অযৌক্তিক ও অবাস্তব—তবু দেশের অধিকাংশ মুসলমান এটা আবেগের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, ইকবাল, সৈয়দ আমেদের আদর্শ, রহমত আলির স্বপ্ন, মুসলিমদের হিন্দু-ভীতি প্রকৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে জিন্না এর ভিত্তিতেই দেশভাগকে ত্বরান্বিত করেছেন—(আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃ: ২৯১)।

আরও বড় কথা হল—এই ধরনের একটা বিকৃত চিন্তা ছিল কংগ্রেস সম্বন্ধে। প্রথম থেকেই এটা ছিল সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয় সংস্থা—হিন্দু-প্রতিষ্ঠান ছিল না। আর. জি. আগরওয়ালের ভাষায়—'The Congress was, from the very start, a national organisation. It represented all sections and classes of the society' --- (কন্‌স্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট, পৃ: ৯৮)। পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে সঙ্কীর্ণ বিকৃত মানসিকতা নিয়ে তাকে দেখেছে এবং এক অবাস্তব দাবিতে দেশকে ভেঙেছেন।

জিন্না বড়লাটকে ভয় দেখিয়েছেন যে, তাঁর দাবি মেনে না নিয়ে কংগ্রেসকে কোনও গুরুত্ব দিলে ফল ভয়াবহ হবে। ইতিমধ্যে দাঙ্গায় বহু জায়গা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষের। সবাই তখন বুঝে গিয়েছে যে, এক ভয়ঙ্কর ও রক্তাক্ত হানাহানি অনিবার্য—(ডঃ নিতাই বসু—'ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃ: ২৩৮)। কংগ্রেসের আপসমুখী নেতারাও নরম হয়ে গিয়েছিলেন। ডঃ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, আসলে, এই দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও তার ভিত্তিতে দেশভাগ আদৌ দেশের সাধারণ মুসলমান সমাজের কোনও উপকারে আসেনি— ('স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন', পৃ: ১১২)। আসলে, এটা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মানুষদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা। বদরুদ্দিন উমর মনে করেন, এতে ওই সম্প্রদায়ের বিত্তশালী অংশের সুবিধে হয়েছে—জিন্না এটাকে একটা চাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সারা দেশের নিম্নবিত্ত মুসলিমদের কিন্তু এতে লাভ হয়নি—('ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', পৃ: ১১৯)। এই সব কথা এবার নতুন করে চিন্তা করা দরকার। ■

এত ষড়যন্ত্র শুধু মোদীকে হঠাতে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ইস্তানবুল বিমানবন্দরে এক যুবক ভারত-বিদ্বেষী স্লোগান লেখা টি-শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী স্লোগান লেখা হয়েছে ওই টি-শার্টে? লেখা রয়েছে— 'আপনারা আপনাদের মেয়েদের ধর্ষিতা হওয়ার জন্য ভারতে পাঠাবেন না।' বোঝাই যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার এ এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। প্রশ্ন উঠতেই পারে— কারা এই টি-শার্ট তৈরি করেছে এবং ইস্তানবুল থেকে কারাই বা এ ছবি ছড়িয়ে দিয়েছে সর্বত্র। এর একটা সহজ এবং সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর— যে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তিগুলি এবং তাদের মদত জোগানো ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি সর্বদা ভারতের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে— তারাই এই কাজটি করেছে। তারা না হয় এ-কাজ করল। কিন্তু এ দেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় কারা এই ছবিটি ছড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করল? এই ইসলামিক শক্তিগুলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কারা বলতে শুরু করল— 'আপনারা আপনাদের মেয়েদের ধর্ষিতা হওয়ার জন্য ভারতে পাঠাবেন না।' ইসলামিক শক্তিগুলির মতোই কারা বিশ্বের চোখে ভারতকে হেয় করার খেলায় মেতে উঠল? সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু নজর করলেই দেখবেন— এই ছবিটি ছড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে এদেশের বামপন্থী, অতি-বামপন্থী এবং তথাকথিত সেকুলাররা। এর পর আর বিশদে ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না— দেশব্যাপী অশান্তি সৃষ্টি করতে, দেশের ভাবমূর্তি মলিন করতে— কারা, কোথায়, কীভাবে, কাদের সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে।

সম্প্রতি আসিফা কাণ্ড নিয়ে সমগ্র দেশব্যাপী হইচই শুরু হয়েছে। বামপন্থী অতিবামপন্থী সেকুলার এবং তাবৎ বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই ঘটনার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে। এদের ভাবখানা এই, যেন এই ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের জন্য বিজেপিই দায়ী। শুধু বিজেপিই নয়, সমগ্র হিন্দু সমাজকেই এরা 'ধর্ষক' হিসাবে চিহ্নিত করে দিতে চাইছে। এদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আবার কয়েকজন প্রাক্তন আমলা প্রধানমন্ত্রীকে রাজধর্ম পালনের উপদেশ দিয়েছেন। অথচ, এই ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনার সবাই নিন্দা করেছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রত্যেকটি বেটি ন্যায্য বিচার পাবে।' তবু আসিফা কাণ্ড সম্বল করে বিজেপি-বিরোধিতা এদের থামছে না। এদের রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যটি অবশ্য ধরে ফেলতেও খুব অসুবিধা হচ্ছে না। যখনই প্রশ্ন উঠছে শুধু আসিফা কাণ্ড নিয়ে কেন— দেশের অন্য অঞ্চলগুলিতেও বহু শিশু কন্যা ধর্ষিতা হয়েছে— সে ব্যাপারে কেন নিন্দামন্দ বা প্রতিবাদ নেই— তখনই এরা চুপ করে যাচ্ছে। এরা নিজেরাই প্রমাণ করে দিচ্ছে, বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায় দেখেই এরা যাবতীয় প্রতিবাদ এবং মোমবাতি মিছিলে আগ্রহী। বোঝাই যাচ্ছে, আসিফা নামক শিশুটিকে সামনে রেখে এরা আসলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে বাজারে নেমেছে। এই রাজ্যে রামনবমীর ঘটনাতেও এদের এই স্বার্থান্বেষী চরিত্রটি পরিষ্কার হয়েছে। রামনবমীর শোভাযাত্রায় ইসলামি জেহাদিদের হামলায় এবার আসানসোলে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনায় সামান্য নিন্দাসূচক শব্দটিও এই বামপন্থী সেকুলাররা উচ্চারণ করেনি। অথচ ওই রানিগঞ্জেই এক ইমামপুত্রের মৃত্যুর ঘটনায় এরা সঙ্ঘ পরিবারের দিকে আঙুল তুলতে শুরু করেছেন। যে-কোনও মৃত্যুর ঘটনাই অতীব দুঃখের। তা নিয়ে কোনও দ্বিমত বা সংশয় থাকাই উচিত নয়। তবু, যখন মানুষের ধর্মীয় পরিচয় দেখেই শুধু শোক প্রকাশ করতে থাকেন এই বামপন্থী এবং সেকুলাররা তখন এদের শোকের আড়ালের রাজনীতিটিই পরিষ্কার হয়ে যায়। বোঝাই যায়, মৃত মানুষের ধর্মীয় পরিচয় দেখে যারা শোকপ্রকাশ করেন— তাদের থেকে বড় সাম্প্রদায়িক আর কেউ নয়।

আসলে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মোদী বিরোধীরা এক সুগভীর চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছে। পরপর কতগুলি ঘটনা বিচার করলেই এদের এই চক্রান্তের চরিত্রটি স্পষ্ট হবে। বিজেপি-র উত্থানকে আটকাতে হবে। এর জন্য দেশের অখণ্ডতা, দেশের সম্প্রীতি সবকিছুকে এরা বিসর্জন দিতে রাজি। গত বছর গুজরাত নির্বাচনের আগে জাতপাতের ঘৃণ্য রাজনীতিকে উসকে দেওয়া হলো। হার্দিক প্যাটেল, জিগ্নেশ মেভানির মতো জাতপাতের রাজনীতি করিয়েদের সঙ্গে হাত মেলালেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী। জাতপাতের রাজনীতি সমূলে উৎপাটিত

করে দেশকে যখন অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য হওয়া উচিত— সেই সময় রাহুল-হার্দিক- জিগ্নেশ এই ত্রয়ী দেশকে আবার জাতপাতের রাজনীতির আবর্তে নিমজ্জিত করলেন। পটিদারদের জন্য সংরক্ষণ চাই— এই দাবিতে গুজরাটে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। এতেই থামল না— গুজরাট নির্বাচনের পরপরই দলিতদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করলেন জিগ্নেশ মেভানি। এবং অবশেষে হালে পানি না পেয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন--- 'আমরা (দলিতরা) সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব।' নিজের ঝুলি থেকে বিড়ালটি নিজেই বের করে দিলেন জিগ্নেশ। এদেশে দলিতদের ধর্মান্তর করিয়ে মুসলমান বানানোর চক্রান্তটি যে কাদের— তা সকলেই জানেন। তাদের সঙ্গে জিগ্নেশের মতো স্বঘোষিত দলিত নেতার গাঁটছড়াটি এতে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদী সরকার নোটবন্দির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একথাও অনস্বীকার্য, নোটবন্দির ফলে সাধারণ মানুষকে কিছুদিন অসুবিধার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। কিন্তু বিরোধী দলগুলি এই নোটবন্দিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে এক অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছিল একথাও ঠিক। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে যদিও এই নোটবন্দির কোনও প্রভাবই পড়েনি। নোটবন্দির প্রভাব পড়বে না বুঝেই উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে মুখে 'আখলাখ' প্রসঙ্গ টেনে এনে মোদী সরকারকে সংখ্যালঘু বিরোধী তকমা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তাতেও অবশ্য কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কারণ, তিন তালাক প্রসঙ্গে নির্যাতিতা- নিপীড়িতা-লাঞ্ছিতা মুসলমান মহিলারা উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে দু-হাত ভরে সমর্থন জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সবরকমের অসহযোগিতার পন্থা গ্রহণ করে বসে আছেন। রাজ্যের আমলাদের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনায় না যেতে, কেন্দ্র চাইলেও কোনও রিপোর্ট না পাঠাতে। এক কথায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কটিকেই অস্বীকার করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বছর সেনাবাহিনীর রুটিন কুচকাওয়াজকে মুখ্যমন্ত্রী বিকৃত ব্যাখ্যা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারি বেশ কয়েকটি প্রকল্প স্রেফ নাম বদল করে এই রাজ্যে চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সব সময়ই চেষ্টা কেন্দ্র সরকারের ভালো কাজগুলিকে আড়াল করে রাখা এবং কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে জনসমাজে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্র কেন? মনে রাখতে হবে--- ভারতের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং চীন চায় না ভারতে একটি শক্তিশালী সরকার দেশ শাসন করুক। তেমনই ইসলামিক শক্তিগুলিও চায় না ভারতে কোনও শক্তিশালী সরকার। কারণ, ভারতে একটি শক্তিশালী সরকার থাকলে, ভারতে আগ্রাসন চালানোটা এদের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। স্বাধীনতার পর থেকেই তাই এদের পছন্দ কংগ্রেস অথবা জগাখিচুড়ি জোট। যে কারণেই কোনও উপনির্বাচনে মায়াবতী বা লালুপ্রসাদের দল ভোটে জিতলে উল্লাসে পাকিস্তানের পতাকা ওড়াতে দেখা যায় কাউকে কাউকে। বিজেপির মতো একটি শক্তিশালী দলকে কখনই এরা কেন্দ্রে ক্ষমতায় দেখতে চাইবে না---এটাই স্বাভাবিক। তাই বিজেপি বিরোধীদের এরা ক্রমাগত মদত দিয়ে চলেছে। সসম্মানে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ারকে। মণিশংকর পাকিস্তানে গিয়ে ভারত বিরোধী কথাবার্তা বলে আসছেন। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত দিল্লিতে গোপন বৈঠক করছেন কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কংগ্রেসের, বিশেষ করে গান্ধী পরিবারের ক্ষমতালিপ্সা। ২০১৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়াটা গান্ধী পরিবার মেনে নিতে পারছে না। আবার তারা এও বুঝতে পারছে— একক ক্ষমতায় বা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় ফিরে আসা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। সেক্ষেত্রে, দেশের সর্বত্র যেনতেন প্রকারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, নানা বিভেদকামী এবং দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চক্রান্ত করে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে তারা। এর জন্য জিগ্নেশ-হার্দিকদের সহায়তায় জাতপাতের দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে তারা যেমন পিছুপা হচ্ছে না, তেমনই কর্ণাটকে ভোটের মুখে লিঙ্গায়ত তাস খেলে হিন্দুদের ভিতর বিভাজন করতেও দ্বিধা করছে না। সোনিয়া-রাহুলের কংগ্রেস যে নীচু-স্তরের রাজনীতি করছে, অতীতে এতটা নীচে বোধকরি কোনও কংগ্রেসি নেতাই নামেননি।

এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। যার ভিতর একশ্রেণীর ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী মায় সরকারি আমলাও রয়েছে। দীর্ঘদিন এরা নানা অবৈধ উপায়ে নিজেদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছেন। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর এদের কামিয়ে খাওয়াটি বন্ধ হয়েছে। এরাও এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে উৎখাত করে আবার পুরনো দিনের বাস্তুঘুঘুদের ফিরিয়ে আনতে। যাতে আবার করেকম্মে খাওয়ার দিনগুলি ফেরত আসে।

নিজেদের স্বার্থে এরা সবাই এখন এক হয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে হঠাতে। আর তার জন্য অন্তরালে এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে এই ষড়যন্ত্র আরও পেকে উঠবে। আরও বিশৃঙ্খলা, আরও নাশকতা তখন প্রত্যক্ষ করবে দেশবাসী। কিন্তু ইতিহাস বলছে, ষড়যন্ত্রীদের কখনও ক্ষমা করেনি দেশের মানুষ। আশা করা যায়, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও দেশবাসী এই ষড়যন্ত্রীদের ক্ষমা করবে না। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ও সনাতন ভারতীয় নীতি

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিকে পশ্চিমের ভাবধারা আরও প্রবল ভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। শিক্ষায় ও চেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে সনাতন ভারতবর্ষের প্রভাবকে ক্রমশ অস্বীকার করার প্রবণতা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে অনেকটা স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালকে ছাপিয়ে উঠে। দীর্ঘকাল নিরীশ্বরবাদী চিন্তাকে মধ্যপন্থী নেহরুপন্থীরা সমর্থন দিয়েছেন প্রছন্নভাবে ও বামপন্থীরা এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যতদূর সম্ভব সনাতন ধারাকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে খাটো করার কাজকে সুনিপুণভাবে রূপরেখা রচনা করে সমাজে তাঁদের মতকে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছে।

কর্ণাটকে নির্বাচনের আগে সংরক্ষণের তাস খেললেন সিদ্ধারামাইয়া।

'দলিত'-দের সামনে রেখে কংগ্রেসের জাতপাতের রাজনীতি।

কিন্তু ঈশ্বরময় ভারতীয় মনের কিছু অংশ এই বিপথে চালিত হলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ এই নিরীশ্বরবাদী বামাচারী ধারাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই শত বাধা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে গেছে সনাতনী ধারায় ও ভারতীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী প্রচারকরা। মাছ জলের বাইরে থাকতে পারে না, তাই ষড়যন্ত্রের পথ নেওয়া শুরু হলো ২০১৪ সালে এনডিএ সরকার বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত হবার পর। প্রথমে সরাসরি নির্বাচনে না পেরে উঠে প্রচারমাধ্যমের এক অংশকে কাজে লাগিয়ে শুরু হলো সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার অপপ্রচার, যাতে মানুষ ভ্রমিত হয় ও বিজেপি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে।

প্রথম শুরু হলো বিহার ও দিল্লি রাজ্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। হঠাৎ দিল্লি নির্বাচনের আগে চার্চ আক্রান্ত বলে প্রচার শুরু হলো, যাতে পশ্চিম বিশ্ব মোদী সরকার সম্পর্কে বিরূপ হয়ে অসহযোগিতা শুরু করে। বিজেপি আগের দিল্লি রাজ্য নির্বাচনে ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ভোটের শতাংশের বিচারে বিজেপির ভোট কমেনি, কিন্তু আসন কমে গেল অনেকটাই। কারণ আগের ৩০ শতাংশ ভোট (যা তারা পেয়েছিল ঠিক আগের রাজ্য নির্বাচনে) বেড়ে ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেল। কারণ সংখ্যালঘু ভোট যা ১২ শতাংশের কাছাকাছি এবং কংগ্রেসের ভোটের প্রায় ৯০ শতাংশেই চলে গেল আপ-এ যার ফলে আপের ভোট শতাংশ ৫০ শতাংশের ওপরে চলে গেল। ঠিক দিল্লি নির্বাচনের পর চার্চ নিয়ে প্রচার শেষ।

বিহার রাজ্য নির্বাচনের আগে শুরু হলো দাদরি ঘটনা নিয়ে পুরস্কার ফিরিয়ে দেবার নাটক। মহাজোটের রণকৌশল। যার ফলে এককভাবে বিজেপির ভোট আগের বারের বিহার রাজ্য নির্বাচনের চেয়ে ৮ শতাংশ বাড়লেও এনডিএ হেরে গেল। পুরস্কার ফেরত দিলেও অধিকাংশই পুরস্কার মূল্য ফিরিয়ে দেয়নি। ঈশ্বর এর মধুর দণ্ড দিলেন। নীতীশকুমার তাঁর দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধু বিজেপির সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক তৈরি করে বিহারে এনডিএ সরকার গঠন করলেন। ঠিক বিহার নির্বাচনের পর পুরস্কার ফেরত নাটকের সমাপ্তি।

এরপর আসি রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের স্থানীয় নির্বাচনের কথায়। মধ্যপ্রদেশে কৃষি আন্দোলন ও ব্যাপম ইস্যুতে রাস্তার রাজনীতি শুরু হলো। আফিম চাষের অন্যায় ব্যবসায় বাধা আসার জন্য হিংস্র আন্দোলনকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মহিমা প্রদান করা হলো। মধ্যপ্রদেশে স্থানীয় নির্বাচনে হারের পর কৃষি আন্দোলন ও ব্যাপম নিয়ে প্রচার শেষ হয়। রাজস্থানে লোকসভার উপনির্বাচনের আগে পদ্মাবত নিয়ে কার্নি সেনাকে দিয়ে হিংস্র আন্দোলন। কার্নি সেনার অপকর্ম বিজেপির ঘাড়ে দিয়ে ভোট জেতার পর কার্নি সেনার উৎসবই প্রমাণ করে দিল তারা কাদের লোক। কংগ্রেসের বিজয়কে মহাসমারোহে পালন করে কার্নি সেনার সদস্যরা। রাজস্থানের উপনির্বাচন শেষ, কার্নি সেনার আন্দোলনও শেষ।

গুজরাট রাজ্য নির্বাচনে হলো নতুন রূপরেখা। হিন্দু ঘরে প্রবেশ করার ছলনায় হিন্দুকেই ভেঙে টুকরো করার পরিকল্পনা। প্যাটেল, ওবিসি, দলিতদের কখনও নতুন সংরক্ষণ, কখনও সংরক্ষণের শতাংশ বৃদ্ধি

ইত্যাদি কম্পিত তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে লড়িয়ে দিয়ে গুজরাট জেতার অঙ্ক। যে করেও গুজরাটের কুড়ি বছরের অধিককাল ক্ষমতায় থাকা সরকারকে হারানো গেল না। গুজরাটে হেরে গিয়েও নীতিগত জয়ের গল্প রচনা হলো। তবে হিমাচল প্রদেশে যেখানে পাঁচ বছরের সরকার পর্যন্ত বাঁচানো গেল না তার ব্যাখ্যায় গেলেন না বিজেপি বিরোধীরা। গুজরাট ভোটে হেরে সংরক্ষণ নিয়ে হিংস্র আন্দোলনে ছেদ পড়ল।

ত্রিপুরায় প্রায় ভোটের দিনকয়েক আগে এল নিমো নমো তত্ত্ব। বার বার দেখানো হলো মানিক সরকার গরিব মুখ্যমন্ত্রী। আর নরেন্দ্রভাই মোদী যে বিশ্বের দরিদ্রতম প্রধানমন্ত্রী সেকথা বলা হলো না। পদবি এক হলেই যে কেউ আত্মীয় হয় না সেটা শিশুও বোঝে। কিন্তু শুরু হলো পদবী মিলিয়ে নোংরা রাজনীতির ষড়যন্ত্র। ত্রিপুরায় বিপুল ভোটে হেরে নিমো নমো সব চুপ, কারণ হালে যে জল নেই তা আগেই জানত। সবচেয়ে মজার গল্প আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে কংগ্রেস সমালোচনা করছে— এই দেখে ঘোড়ায়ও হাসবে। উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগেই হিন্দু ভোট ভাগ করে দলিতদের সংগঠিত করার চেষ্টা হলো। ভুলেও কেউ বলল না যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তিনি ছিলেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র প্রার্থী। ভারতের সবচেয়ে বেশি দলিত এম এল এ এবং এম পি বিজেপির থেকে। কংগ্রেস ও বিরোধী শাসিত রাজ্যে দলিত নিগ্রহ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দলিত নির্যাতনে যারা মুখে কুলুপ দিয়ে বসে থাকে তারাই বিজেপি শাসিত রাজ্যে পান থেকে চুন খসলেই তিল কে তাল করে প্রচারে নেমে পড়ছে। এত করেও যখন উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল ভাবে জিতল রব তোলা হলো ভোটিং যন্ত্র নিয়ে। জেনে শুনেই। যে রাজ্যে বিরোধীরা জিতছে সেখানে চুপ, যেখানে হেরেছে সেখানেই ভোটিং যন্ত্র খারাপ। নির্বাচন কমিশন তথ্যসহ ন্যায়ালয়ে এলে তৈরি বলে জানাতে কেউ আর ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়নি।

২০১৪-র পর ষোলটা রাজ্যের জয়কে ছোট করে দেখিয়ে আটটা লোকসভা আসনে উপনির্বাচনে হারটা বড় করে দেখিয়ে বিজেপি-কে অপদস্থ করার চক্রান্ত হলো। সমস্ত বিষয় যেগুলো নিয়ে বিজেপিকে অভিমুন্যের মত বধ করা যায় তার চক্রব্যূহ রচনা হলো। শত চেষ্টাতে কাঙ্ক্ষিত ফল হচ্ছে না। তাও হাল ছাড়া চলবে না। মহারাষ্ট্রে কৃষকদের যাত্রা। সেটা কমিউনিস্ট পার্টির বিপুল সাফল্য। এত সাফল্য যে ত্রিপুরার হারকেও তা ম্লান করে দেয়। কৃষকদের মুখে স্লোগান কী ছিল— 'জয় শিবাজী', 'জয় ভবানী' বিভিন্ন ভাবে পাওয়া খবরে সেকথাই প্রকাশিত। তাছাড়া একটা কথা, কমিউনিস্ট পার্টির যদি এতই সমর্থন তাহলে মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বামপন্থীদের দূরবীক্ষণ দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? মহারাষ্ট্রে বিজেপি স্থানীয় নির্বাচনে একা যতগুলো আসন পেয়েছে কংগ্রেস, শরদ পাওয়ারের দল, শিবসেনা মিলে তার অর্ধেকের কম আসন জিতেছে। তা নিয়ে লেখা কোথায়? পঞ্চম পাতার কোণের দিকে। আর বিজেপি স্কুল নির্বাচনের পরিচালন সমিতিতে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে হারলে খবর কোথায়? প্রথম পাতার মাঝখানে। মহারাষ্ট্র সরকার কৃষকদের সব দাবি মেনেছে সেকথা অল্প প্রচারিত।

ঈশ্বর ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়, সবাই একটা পক্ষ ধরে আছে। নিরপেক্ষতা সোনার পাথর বাটির মতোই কল্পিত স্তর। সেটা নিয়ে বাণিজ্য হয় মাত্র। সেই আদর্শে কেউ নেই। সবাই যে যার মতো করে ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করছে মাত্র। বাংলা ভাষায় হিন্দুর পক্ষে লেখা, বিজেপির হয়ে কথা বলা নিজের আর্থিক স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মতো। বিশ্বে বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন তাঁদের ৭০ শতাংশই অহিন্দু, মাত্র ৩০ শতাংশ হলো হিন্দু। বাংলা ভাষাভাষিদের মধ্যে হিন্দুই সংখ্যালঘু। স্বাধীনতার সময় ছিল ৪৬ শতাংশ, এখন মাত্র ৩০ শতাংশের আশেপাশে।

এবার আসছে কর্ণাটকের রাজ্য নির্বাচন। হিন্দুকে বিভক্ত করার জন্য বিজেপির সমর্থক লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়কে অহিন্দু বলে ঘোষণা করা। সংখ্যালঘু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশ করার চেষ্টা। সংবিধানের Article-30-এর সুবিধা সকলের জন্য প্রসারিত করা হোক। সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং-য়ের নামে হিন্দুকে ভাঙ্গো আর অহিন্দুকে জোড়ো— এ তত্ত্ব আর বেশিদিন চলবে না। তারপর কর্ণাটকের আলাদা পতাকার দাবিও রাজ্য থেকে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। বিজেপি ভোটে জেতার জন্য এই সর্বনাশা খেলায় মাতেনি। সে জিতবে স্বাভাবিক ভাবেই। কর্ণাটকে রায় ভোটের পর জানা যাবে, তবে বিভিন্ন সূত্রে যা খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে পরিষ্কার কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী থাকবে না।

যাঁরা নিত্য বিজেপিকে সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয় তাঁরা ৭০ বছরে বিজেপিপন্থী ও সঙ্ঘপন্থী শিক্ষিত সমাজকে সবরকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে নির্মম ভাবে। ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে যে ঘটনাকে অতি প্রচারিত করলে অহিন্দুকে সংগঠিত, পেট্রোডলার ও ইউরোডলারে সমৃদ্ধ হওয়া যাবে তাই করা হয়েছে অবাধে। আর একই ঘটনা হিন্দুর সঙ্গে হলে ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে অপযুক্তি খাড়া করে। এই খেলাও চলছে ৭০ বছর ধরে।

কিন্তু প্রযুক্তি বিভাজনের উন্নতির ফলে এ চাতুরিতে আর চিঁড়ে ভিজবে না। ২০১৯-এ এত করেও মোদীজিকে আটকানো যাবে না। বিজেপি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবে। যাঁরা পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে রাজনীতি করে তাঁদেরকে পরিবার আগে ও রাজনীতি পরে এটাই ভাবতে হয়। আর যাঁরা প্রচারকদের মতোন জীবন যাপন করে রাজনীতি করেন তাঁদের কাছে সনাতন আদর্শবোধটাই সব। সেখানে দেশ রক্ষার্থে রাজনীতি। নীতিকে কেন্দ্রে রেখে রাজ্য পরিচালনার পথে সনাতন ভারতের আদর্শই পাথেয় হোক।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

পঞ্চায়েতের পাঁচকাহন

দীপক কুমার ঘোষ

''গণদাসস্য তে গর্বঃ
ষড়ভাগেন ভৃত্যস কঃ।।''

''জনগণের দাস, তোমার আবার গুমোর কিসের?
তুমি তো আমাদের ফসলের দু'ভাগের এক ভাগ বেতনের ভৃত্যমাত্র।''

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের 'চন্দ্রকীর্তি' পুস্তকে এই দু'টি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ রয়েছে।

অতিরিক্ত মনোনয়নের দিনেও অশান্তি। গুলিতে প্রাণ গেল বিজেপি কর্মীর।

অন্য গোষ্ঠীর, অন্য সমাজের ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে সেকালে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের দৈহিক, সম্পত্তির মূলত গোধন ও আয় মূলত ফসলের সুরক্ষার জন্যই গোষ্ঠীপতি, সমাজপতি এবং দেশপতি নির্বাচিত হতেন। যে-কোনও স্তরেই কুশাসন ও অপদার্থতা প্রমাণিত হলে গোষ্ঠীপতি, সমাজপতি, এমনকী শাসকও অপসারিত হতেন।

এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে (গ্রাম) সমাজ সুরক্ষিত ও সুশাসিত হতো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। প্রয়োজন হলেই পঞ্চায়েত বসতো বটবৃক্ষের ছায়ায় বা চণ্ডীমণ্ডপে। পাঁচ মাথা পাকা চুলেরই হতো। গ্রামের সাধারণ সমস্যা ও ব্যক্তির বা পরিবারের সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উপস্থিতিতেই আলোচনা হতো। সমস্যার সমাধানও হতো। লিখিত কোনও আইন ছিল না। সমাজের বিধি ছিল, পঞ্চায়েতের বিধানও ছিল। প্রচলিত রীতিনীতিও ছিল। পঞ্চায়েতের বিধান অবশ্যমান্যও ছিল।

আফগান, পাঠান, তুর্কী ও মুঘল শাসকেরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেননি। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন ১৮৬১ সালে ইংলেন্ডেশ্বরীর রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হলো, তারপর ধীরে ধীরে ইংরেজশাসিত এলাকায়, বিশেষ করে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে, তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, যদিও খুব ধীরগতিতে, কয়েক বছর পরপরই নতুন নতুন আইন করে, ভারতবাসীর প্রতিনিধিদের গ্রামে ও শহরে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসনের দায়িত্ব দিতে শুরু করে।

১৮৬২ সালে সর্বপ্রথম বাংলা প্রেসিডেন্সিতে যার মধ্যে ছিল বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও অসম এবং বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার দেশীয় রাজন্যদের এলাকা বাদে, সমগ্র পূর্বাঞ্চল, সেখানে ছোটলাটের সভাপতিত্বে ১২ জন মনোনীত সদস্যকে নিয়ে বিধান পরিষদ গঠিত হলো। দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন হলো।

বিধান পরিষদের মনোনীত ভারতীয় সদস্যদের দাবিতেই স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন আইন পাশ হলো— গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড— একই থানায় একগুচ্ছ মৌজা (বড় গ্রাম বা ছোট ছোট বসতির সমষ্টি) নিয়ে--- একজন মনোনীত প্রেসিডেন্ট--- অধিকাংশ রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, জমিদার, এমনকি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলা হতেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট— এক একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হলো। প্রত্যেক বোর্ডে একাধিক চৌকিদার থাকতো, নীল পোশাক, কোমরবন্ধ, ধুতি বা লুঙ্গি, খালি পা। চৌকিদারেরা ছিলেন পুলিশের স্থানীয় খোচর। প্রতি মাসে থানায় গিয়ে চৌকিদারি প্যারেডে অংশ নিয়ে বেতন সংগ্রহ করতেন। ক্রমে ক্রমে চালু হলো পথকর, পূর্তকর, শিক্ষা সেশন, জমির বাৎসরিক খাজনার সঙ্গে জমিদারেরাই সেসব কর সংগ্রহ করে বাংলা বছরের শেষদিনের মধ্যে জেলার সদরে রাজ্যের ট্রেজারিতে জমা দিতেন।

ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়া জেলায় জেলায় ছিল জেলা বোর্ড। বর্ধিষ্ণু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা সদরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, শহরে পাকা রাস্তা, গ্রামে কাঁচা রাস্তা, শহরে নলবাহিত জল, গ্রামে জমিদারের মৃত বাবা বা মায়ের নামে পুষ্করিণী, বড় শহরে পথে আলো সবই হয়েছিল ধীরে ধীরে জনগণের দেয় অর্থে। গ্রাম শহরের লোকের অভাববোধ কমই ছিল। তাই অভিযোগও ছিল না। যা পাওয়া যেত, সেটুকুই উপরি পাওনা বলে সাধারণ মানুষ ধরে নিতো। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য নব্বই (১৮৫৭-১৯৪৭) বছরের লড়াইয়ে কখনও সংগঠিত ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থাকে প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার চিন্তা করা হয়নি।

সংবিধান রচনার তিন বছরকালে গ্রামীণ স্বায়ত্ত্বশাসনের কথা কারো মনেই আসেনি। সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত করবার সময় তাই গ্রামীণ স্বায়ত্ত্ব শাসনের পঞ্চায়েতের অধিকারকে সংবিধানের তৃতীয় অংশে ব্যক্তির অধিকারের তালিকায় রাখতে সবাই ভুলে গিয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে মনে পড়লে, সংবিধানের চতুর্থ অংশে করণীয় নীতি সমূহের তালিকায় ৪০ নং বিধিতে/ধারায় বলা হলো :

''গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠনে রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে এবং তাদের এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেবে যাতে তারা স্বায়ত্ত্বশাসনের অংশ হিসাবে কাজ করতে পারে।''

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে

(১৯৫১-৫৫) কিছুই করা হয়নি। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সুপারিশ মেনে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় এবং গ্রাম, অঞ্চল, ব্লক ও জেলাস্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু তাদের যথেষ্ট অর্থ কখনোই দেওয়া হয়নি।

যেহেতু, অধিকাংশ পঞ্চায়েতই কংগ্রেসের দখলে ছিল, তাই ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেই ৪টি স্তরেই পঞ্চায়েত ভেঙে দেয়। জেলাস্তরে শুধু জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে রেখে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে জেলাশাসকের অধীনে মূলত জেলা পরিষদের রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ ও কিছু মামুলি কাজ দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালে ক্ষমতায় এসে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সরকার ১৯৭৩ সালে নতুন আইন পাশ করে, যাতে চার স্তরের বদলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কথা বলা হয়েছিল। সর্বনিম্ন গ্রামস্তরের পঞ্চায়েত তুলে দিয়ে জনগণকে সরাসরি নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ ও এলাকা উন্নয়নের অধিকার ও দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় থেকেই সেই সরকার পঙ্গু হয়ে পড়ায়, নতুন আইন অনুসারে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে যেতে পারেনি।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেই বামফ্রন্ট সরকার সে বছরের বন্যাত্রাণ ব্যবস্থায় ব্যাপক সুফল নিয়ে ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে গ্রামীণ এলাকার সেই যে চিরস্থায়ী দখল নিয়েছিল, তাতে পরবর্তী বিশ বছর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল।

গোল বাধলো ১৯৯৮-এ সদ্যগঠিত তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের 'চুপচাপ ফুলে ছাপ'-এর আহ্বানের মোকাবিলা করতে সিপিএম দাঁত নখ বের করল। সেই দাঁত নখ গুলি বন্দুকে পরিণত হলো ২০০৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে। রক্তাক্ত তৃণমূল কংগ্রেস গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে যে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেছিল তা ২০০৮ সালেই প্রত্যাশিত ফল দিল। তৃণমূল কংগ্রেস দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও অন্য জেলা পরিষদ দখল করল। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অধীনে। কংগ্রেস মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা পরিষদ দখল করেও ধরে রাখতে পারলো না। সরকারি ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করেই তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসের প্রতীকে জেতা অধিকাংশ সদস্যকে তৃণমূল কংগ্রেসে ঢুকে পড়তে বাধ্য করলো।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই শাসকদলের সর্বোচ্চ নেত্রী থেকে শুরু করে চুনোপুঁটি নেতাও বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েতের ডাক দিয়েছেন। এর মধ্যে সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত ওরফে কেষ্ট মণ্ডল। তাঁর নেত্রীর কথায়, কেষ্টর মাথায় অক্সিজেন কম যায়। অক্সিজেন যে মাথায় যায় না, ফুসফুসে যায়, তা নেত্রীকে কে বোঝাবে? তিনি তো সবজান্তা।

কিন্তু এবার ফেঁসে গেছেন। কথায় আছে, অতি চালাকের গলায় দড়ি। ফেব্রুয়ারি মার্চ জুড়ে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকের নামে শুধু থানার দারোগাই নয়, নিজের দলের সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাপতিদেরও প্রকাশ্যে ঠারেঠোরে এবং গোপনে সরাসরি পঞ্চায়েত নির্বাচন বিশ্ব শ্রমিক দিবস ১ মে থেকেই শুরু তা বলে কী কী করতে হবে সেসব কেষ্ট ওরফে অনুব্রত মণ্ডলের মতো প্রকাশ্যে না বললেও বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু প্রকাশ্যে যা বলেছিলেন, তাতে শুধু ক্রীতদাস সংবাদমাধ্যমই নয়, সিপিএম, কংগ্রেস, এমনকী ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দও ধরেই নিয়েছিলেন যে, পঞ্চায়েত নির্বাচন জুনের শেষে, এমনকী জুলাইতেও হতে পারে। বর্তমান পঞ্চায়েতগুলির মেয়াদ শেষের অল্প কিছুদিন আগেই পঞ্চায়েত সদস্যদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না, তাঁরা নিজের নিজের দায়িত্ব বুঝে নিতে পারবেন।

জেলায় জেলায় দলকে প্রস্তুত হতে বলে এসেই তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারও 'জো হুকুম' বলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে দিলেন। হতভম্ব বিরোধীরা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে প্রতিবাদ করলো। কিন্তু নির্বাচন কমিশনার সেসব প্রতিবাদ কানেই তুললেন না। বামফ্রন্টের আমল থেকেই এ রাজ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে শাসকদল কখনও কান দেয় না। তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিলে, অফিস ভাঙচুর করলেও এখন আর শাসকেরা বলেন না, 'আসুন, আলোচনা করা যাক।' শাসক ও বিরোধীদলগুলি সবসময়ই 'যুদ্ধং দেহি' মেজাজে। গণতন্ত্রের পদ্ধতি যে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, শাসকের এক দু' পা পিছু হটে বিরোধীদের ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ দাবি বিচার বিবেচনা করে একটু আধটু হলেও মেনে নিলেই যে গণতন্ত্রের পথচলা মসৃণ হয়— তা মানতে শাসকেরা কখনোই প্রস্তুত নয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলগুলিকে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট মেনে নিয়েই তড়িঘড়ি করে প্রার্থী বাছাই করে মনোনয়ন পত্র পেশ করবার প্রস্তুতি নিতে হলো। জাতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই বামফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতের প্রস্তাব দিয়েছে। বামফ্রন্ট, বিশেষ করে সিপিএম তাঁদের পার্টির আভ্যন্তরীণ প্রবল দ্বন্দ্ব নিয়েই অন্তর্কলহে দীর্ণ।

একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ। কিন্তু পুলিশ, বিশেষ করে সিভিক পুলিশ সরাসরি তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী রক্ষীবাহিনী হয়ে কাজ করছে, তাই ভারতীয় জনতা পার্টিও বহু আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি।

নির্বাচন কমিশনার ধ্যাতানি খেয়ে ডিগবাজি খেলেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের অতিরিক্ত দিন বাতিল করলেন। সুপ্রিম কোর্ট বল ঠেলেছে হাইকোর্টে। হাইকোর্ট নিশ্চয়ই সুবিচার করবে। জনগণের আশা হাইকোর্ট পুরো প্রক্রিয়াই বাতিল করে নির্বাচন কমিশনকে একেবারে নতুন করে সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দেবে। আগে জমা পড়া সমস্ত মনোনয়নপত্র-সহ নতুন জমাপড়া মনোনয়নপত্রগুলি নিয়েই নির্বাচন হোক। আইনানুযায়ী প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবার পর ২১ দিন প্রচারের জন্য সময় দিয়ে নির্বাচন হলেই ভালো হবে।

১৯৯৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তাঁর মনোনীত প্রার্থীদের সবাইকে প্রদেশ কংগ্রেস প্রার্থীপদ না দেওয়ায়, মমতা ব্যানার্জি আলিপুর কোর্টের সামনে একটি গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে গলায় কালো শাল জড়িয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত ঘোষ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাসিতে গড়িয়ে পড়েছিলেন।

এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী! তাঁর অতি চালাকি ধরা পড়ে গেছে। এখন তিনি কি করবেন?

(লেখক প্রাক্তন আমলা ও বিধায়ক)

বদল নয়, বদলার রাজনীতি

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে আজ যে চিত্রটি পরিষ্কার হলো তা ১৯৭২-এর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভোটলুট ও বোমাবাজির চিত্রটি স্মরণ করিয়ে দেয়। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন— 'বদলা নয় বদল চাই।' মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালে দু'দুবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। গতবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গঠনে জোরজবরদস্তি করে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন তুলিয়ে নিয়ে বিজয় মিছিলের উল্লাস আজও ভুলে যাওয়ার কথা নয়। আজ তারই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। একদিন সিপিএমের হার্মাদের বিরুদ্ধে তৃণমূলনেত্রী যে অত্যাচারের আঙুল তুলেছিলেন আজ তারাই তৃণমূল দলের সম্পদ। ওদের ঝেড়ে ফেলার সৎসাহস তৃণমূলনেত্রী দেখালে দলটির অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হবে। অতএব বদলার পরিবর্তে বিরুদ্ধ জনমতকে সুকৌশলে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া বদল তত্ত্বের আমদানি করে নির্বাচনে জুলুমবাজি বিগতদিনের কংগ্রেসের অপশাসনের ফসল ছাড়া আর কী?

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল নেত্রী বিজেপিকে আটকাতে সাইনবোর্ড সর্বস্ব কংগ্রেস ও কোমায় যাওয়া সিপিএমকে রেওয়াত করেননি। সিপিএম এবং কংগ্রেসের গোপন বোঝাপড়া তৃণমূল নেত্রীর মাথাব্যাথার কারণ নয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির উত্থান তার মাথাব্যাথার কারণ। অতএব বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত হাসিল করতে সন্ত্রাসের আবহাওয়া এবং নির্বাচন কমিশনকে পুতুল বানিয়ে রাখা একান্ত জরুরি ছিল। সেই কাজে তৃণমূল নেত্রী সফল। বিজেপি জুজু তৃণমূল নেত্রীর মতো সিপিএম ও কংগ্রেসের আছে। তাই আসন্ন ১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল নেত্রীর মনোবাসনা পূর্ণ করতে সিপিএম ও কংগ্রেস একই রাস্তায় শামিল হবে না, একথা কি জোর দিয়ে বলা যায়? ৩৪ বছরের সিপিএমের শাসনকালে কংগ্রেস নামক বি টিমের খেলোয়াড়রা এবং এখন সাইড লাইনে বসে থাকা সিপিএম নেতৃবৃন্দ জোটবদ্ধ ভাবে তৃণমূল দলের হয়ে মাঠে নেমে পড়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সুজন ও মান্নানের হরিহর আত্মা হয়ে ওঠা তারই ইঙ্গিত বহন করছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে তৃণমূলকে ভোট দেবার ফরমান জারি করেছেন। দলের আদর্শ বড় নয়, বিজেপি বিরোধিতায় মুসলমান ভোট ধরে রাখাই দলের সুচতুর কৌশল। তৃণমূল নেত্রী এটা ভালো করে বুঝেছেন বলেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের ক্যাডারদের দলের আসল শত্রু বিজেপিকে রুখতে সিপিএম ও কংগ্রেসকে খড়ের পুতুল বানিয়ে শত্রু খাড়া করে লড়াইয়ে যেতে বলেছেন। হায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি!

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

কাঠুয়া নিয়ে রাজনীতি

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে কাঠুয়া-তে নাবালিকা ধর্ষণ, নিন্দনীয় সংবাদ নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ কেমন সংস্কৃতির প্রচার মিডিয়াবাহিত হয়ে পৌঁছচ্ছে বিশ্ববাসীর কাছে? বিজেপি-রাজনীতির নিজস্ব ছাপমারা ভারত? পেশিশক্তির উদ্‌যাপনে রাজনৈতিক সিদ্ধির আরাধনা! বিজেপির নামও যারা জানত না, এই লাগাতার নেগেটিভ প্রচার- প্ররোচনায় এবার নির্ঘাৎ তারা অতীতকালের বিখ্যাত সিনেমার জনপ্রিয় গান গেয়ে উঠতেই পারে, সফল হোগি তেরি আরাধনা...

ধর্ষণ-টর্ষণ নাকি লোকজন ভালো খায়। বিক্রি বাড়ে কাগজের। অন্য খবর চেপে দিয়ে তাই ধর্ষণ পরিবেশনে অনেকেই উদ্যোগী। কিন্তু আমি এই সূত্রে আলাদা একটা ব্যাপার ধরতে চাইছি। হিন্দু-রাজনীতি, হিন্দুত্ব, এসব কত খারাপ, নানাভাবে নানান কুৎসিত বীভৎসতায় তা প্রচারের প্রতিযোগিতা চলেছে। যেন এই কুৎসিত তরজা চালানোর জন্যই ঘটনার অভিঘাত জিইয়ে রাখতে হবে। দেখেশুনে মনে হয়, যেন আরও অনেক ঘটনা এভাবে ঘটানো হবে, ঘটতেই থাকবে বেশি বেশি করে ২০১৯-এর আগে। কে কত বড় বিদ্বজ্জন, কত গরিব আঁতেল, বোঝাবার জন্য হিন্দুধর্ম যে কতখানি নোংরা, তা ব্যাখ্যার ঢল নামবে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ধর্ষণ নয়, হিন্দুরা কতটা খারাপ— এটাই আদত কথা। ভিন্ন ধর্মীদের কি খুশি করা যায় এভাবে নিজেদের মধ্যে নোংরা ছোঁড়াছুড়িতে? নাকি এই ছড়ানোর পেছনেও আছে পেট্রো-ডলারের মোহময় হাতছানি?

হিন্দু বলে যে মনোলিথিক কিছু হয় না, তা বুঝতেন ডাঃ হেডগেওয়ার, লেখাপড়া জানা লোক বলে। মনে পড়ে, সেই বিল্লা-রঙ্গার ঘটনা? রাজধানীর বুকে ধর্ষণ ও খুন? তখন প্রশ্ন উঠেছিল, হিন্দু না অহিন্দু? কিন্তু অনতি-অতীতে কলকাতার খুব কাছে যখন কামদুনির ঘটনা ঘটে গেল, রাজনীতির রসায়নজারিত মিডিয়ায় ঠিকঠাক কথাগুলো লেখা হলো না বলেই বাতাসে ফিসফিস করে খবর রটে গেল। দোষীরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের বলেই শাসক দলের মদতে তাদের পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে পাশের দেশে। কোনও একটি শাসক দলের এতে দোষ দেখি না, বামফ্রন্ট আমলেও আমাদের কিশোরবেলায় ঠিক এমনটি ঘটতে দেখেছি। মিডিয়ার বাহুল্য তখন এতখানি ছিল না, বিপরীতে, বামপন্থীদের সর্বগ্রাসী দাপট ছিল তীব্র। 'আমরা সাপ হয়ে দংশন করব, আবার আমরাই ওঝা হয়ে সে বিষ নামাব। কারণ আমরা 'শাসক দল', হে দুঃস্থ বাবাসকল, আমার নিকটে আইস, আমরাই তোমাগো বাঁচাইব'...প্রেস? মিডিয়া আরে ব্যবসাটা তো এই মাটিতে দাঁড়িয়েই করছ, সেটা মনে রেখো, বাছাধন! এই অ্যাটিটিউড, রাজ্যস্তরে, এই আমলেও তীব্র। তবে দক্ষিণপন্থী দলে রেজিমেন্টেশান, এই দেশে অন্তত তেমন তো থাকে না, তাই যে যা খুশি বলে যেতে পারে, ভুলভাল গপ্পোও ছড়াতে পারে বিরুদ্ধবাদীরা।

এইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে কথা বলতে চাই। যাহোক করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হ্যাটা করতে হবে, তাই কি কাঠুয়া

আর উন্নাও নিয়ে এত চেঁচামেচি? আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব দুঃসাহসী কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান বা ডিজিপি ক্ষেত্রে এখনই কোনও ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে না বলেই কোনও কোনও মহল থেকে জনগণের দৃষ্টি বা ভাবনার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে? আবারও বলি, ধর্ষণের খবরগুলো খারাপ নিন্দনীয়। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, অনেকগুলো খবরই মাঝখানে হারিয়ে যায়, চেপে দেওয়া হয়। উন্নাও ঘটনাতেও তো শুনেছি দুইটি পরিবারের মধ্যে নাকি বেশ ভাবসাব ছিল!

কোনও ধর্ম বলে না, ধর্ষণ করো, দাঙ্গা লাগাও। এসব ঘটে কোনও জমি-ভূমি-সম্পত্তি দ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক অহং-চরিতার্থতার বাসনা থেকে। ধনী দেশ অস্ত্র বিক্রি করবে গরিব দেশদের, তাই যুদ্ধ-যুদ্ধ হুঙ্কার। এই পটভূমিতে, কী আজব জাতি এই বাঙালি, হিন্দুত্ব নিয়ে যাদের কোনওদিনই কোনও অস্মিতা ছিল না, তারাই হিন্দুত্ব, তথা নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে গাল পাড়ছে!

—রূপসনাতন রায়বর্মণ,
মধ্যপাড়া, রহড়া।

রোহিঙ্গা আমন্ত্রণ, সাধু সাবধান

গত কদিন ধরেই মিডিয়ায় একটা ভিডিও খুব ভাইরাল হয়েছে আর তা হলো— একটা ট্রাকে করে আসা একগাদা বাচ্চাকাচ্চা সমেত রোহিঙ্গা মুসলমান পরিবার। ভিডিওটিতে দেখলাম ট্রাকে চেপে বারুইপুরে নামা লোকগুলো আস্তে আস্তে বিপুল বাচ্চাকাচ্চা সমেত গ্রামের ভিতরে ঢুকে গেল। আচ্ছা এই ঘটনা আজ কদিন আগেই ঘটলো তো? গোটা রাজ্য জুড়ে ঝড় উঠলো, বহু মানুষই হৈচৈ ফেলে দিল, কেউ বিএসএফের দোষ দিল, কেউ কেন্দ্র সরকারের আবার কেউ রাজ্য সরকারের। বিভিন্ন কাগজেও বেরোল, আলোচনা সমালোচনা সবই হলো।

কিন্তু মজার ব্যাপার দেখুন আমরা এখন সবাই ব্যস্ত হয়ে গেছি দৈনন্দিন কাজে... বাংলাদেশকে হারানো বা রামনমবমী নিয়ে তর্জায়...। আসলে মায়ানমার সরকার এদের খেদিয়ে দিচ্ছে... আর তার কারণ এদের জঙ্গিপনা...। বহু বৌদ্ধকেই এরা মেরেছে ধর্মীয় কারণেই, তাই সে দেশের সরকার বুঝছে দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। ফলত এই বিতাড়ন।

এবার ভাবতে হবে... আমাদের রাজ্যে এলে ক্ষতিই বা কী? প্রথমত জানাই ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা দেশের এই রাজ্যের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। এরও আবার বিভিন্ন ভাগ আছে, যেমন পাশেই থাকা বাংলাদেশের মৌলবাদী জামাত এ রাজ্যে ভাষাগত ভাবে মিলের ফাঁক ধরে বসবাস শুধু নয়, বোম বানানোর, অস্ত্র পাচারের মাধ্যমে প্রতিটা সীমান্তবর্তী জেলায় ঘাঁটি বানাতে চলেছে। আর তা আমরা খাগড়াগড়, কালিয়াচক এইসব ক্ষেত্রে দেখেওছি।

আর বর্তমানে রাজ্য সরকার যে ভাবে কেন্দ্রের রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে নেওয়া স্ট্যান্ডের বিরোধিতা করে রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বসানোর চিন্তা করেছেন, তাতে খুব শীঘ্রই রাস্তায় ঘাটে রোহিঙ্গা মুসলমানদের চাপাতি হাতে ঘোরা সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠবে। মনে রাখবেন কোনও এলাকায় যদি কোনওভাবে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব হয় আর সেখানে যদি এইসব বিদেশি জেহাদি রোহিঙ্গা মুসলমানরা আক্রমণে নামে তাহলে সাধারণ মানুষজনের কী অবস্থা হবে...? যাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মায়ানমারের বৌদ্ধরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে দেশ থেকে খেদিয়ে দিলো, সেই তাদের এ রাজ্যে আমন্ত্রণ এ এক অশনি সংকেত।

—রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বাউড়িয়া, হাওড়া।

ভারতে সবুজ বিপ্লবের অন্যতম প্রাণপুরুষ বশী সেন

শ্রীশ্রী মা সারদা, সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিস্টিন, স্বামী সদানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য জগদীশ চন্দ্রের স্নেহধন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন (১৮৯৭-৩১ আগস্ট, ১৯৭১) ১৯২৪ সালে কলকাতার ৮ নম্বর বোসপাড়া লেনে স্থাপনা করেন 'বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরি'। ১৯৩৬ সালে স্বামীজির অন্যতম প্রিয় পাহাড়ি স্থান আলমোড়ায় তা স্থানান্তরিত করেন। তিনিই ভারতে প্রথম গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরার সফল সঙ্করায়ণ ঘটান। তাঁর উদ্ভিদ কোষতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, উদ্ভিদ হর্মোন সংক্রান্ত গবেষণা উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর তাঁকে ফলিত উদ্ভিদ বিদ্যার গবেষণায় প্রেরণা জোগায়। উত্তরপ্রদেশে তিনি কৃত্রিম মাশরুম চাষের সূত্রপাত ঘটান। মানুষ হিসাবে তিনি একজন হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। দরিদ্র, বুভুক্ষু মানুষের জন্য কৃষি বিজ্ঞানে কাজ করে ১৯৫৭ সালে তিনি পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি 'ওয়াতুমল ফাউন্ডেশন পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ভারতে সবুজ বিপ্লবের অন্যতম পুরুষ। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭৪ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার আলমোড়ার গবেষণা কেন্দ্রটি কেন্দ্রীয় সরকারের আই সি এ আর-কে হস্তান্তর করে। এর নতুন নাম হয় 'বিবেকানন্দ পার্বত্য কৃষি অনুসন্ধানশালা'। তাঁর জন্ম বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের গড়দরজা পাড়ায়। বশী সেনের সহধর্মিণীর নাম গারট্রুড এমার্সন। আমেরিকান এই মহিলা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলো, 'এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদিকা এবং আমেরিকান এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যা। তাঁর লেখা গ্রন্থ 'ভয়েসলেস ইন্ডিয়া'-র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরি। বেলুড় মঠ ও মিশনের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন এবং স্বামীজির শিষ্য-শিষ্যারা তাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞান গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' শেষ করেন আলমোড়ায় এসে। বশী তখন আলমোড়ায় গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত। তিনি বশীকে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে নেন। বশী অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়েন। রবীন্দ্রনাথ তাতে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং তা বইটিতে লিপিবদ্ধ আছে। তাকে নিয়ে, তার গবেষণা খামার নিয়ে 'দেবতাত্মা' খ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল অনেক তথ্য দিয়েছেন।

—ড. কল্যাণ চক্রবর্তী,
কল্যাণী, নদীয়া।

পরিবেশ রক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

পরিবেশ দূষণ আজ এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। এর কুফল আমরা সবাই কম-বেশি অনুভব করছি। অথচ আজকের এই বিষম পরিস্থিতির জন্য যে আমরাই দায়ী— সেকথা মন খুলে কতজন স্বীকার করি? পৃথিবীর সুরক্ষার জন্য আমরা কতজন আন্তরিকভাবে আগ্রহী? একথা আমরা মানতে বাধ্য যে, পৃথিবীর জন্যই আজ আমাদের অস্তিত্ব আছে, বিশেষত বিনাশমুখী পৃথিবীতে আমরা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের ধ্বংসকেই আহ্বান করে চলেছি।

নানান প্রশ্ন, বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা কথা স্পষ্ট যে, পৃথিবীকে রক্ষা করার সময় ধীরে ধীরে আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা কীভাবে ভুলে গেলাম যে পৃথিবী কেবল আমাদের উপভোগের বস্তুমাত্র নয়, আমাদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ গাছপালা, জন্তু-জানোয়ারেরও বাসস্থান। তা সত্ত্বেও জ্ঞানে-অজ্ঞানে পৃথিবীর নানান সংসাধনগুলি নষ্ট করা আমাদের জীবনসত্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রতি কুড়ি মিনিটে একটি করে প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যমগুলি এই বিষয়ে জনসাধারণকে জাগরুক করা যথেষ্ট প্রয়োজন মনে করছে না।

আমরা অনেক সময় ভেবে থাকি যে, পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা দায়ী নই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে— আমরা কি বাড়িতে থাকি না? বাসস্থান তৈরির জন্য ইঁট, সিমেন্ট, বালি, জল, কাঠ স্টিল এগুলি এল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন খাদ্য, বিদ্যুৎ, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যাবহারের ক্ষেত্রেও ওঠে। সুতরাং আমরা একথা মানতে বাধ্য যে, আমাদের উপযোগের প্রতিটি জিনিসের জন্য আমরা নিরন্তর পৃথিবীকে শোষণ করে চলেছি।

পৃথিবীর প্রতি আমরা প্রত্যেকে অপরাধী— এই সত্যকে স্বীকার করে এগিয়ে গেলেই সঠিক পথে চলার প্রথম পদক্ষেপ সিদ্ধ হবে। এখনও সংশোধনের সময় আছে। আমরা আমাদের ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাত্রার সংশোধন করতে পারি। পৃথিবীর সংসাধনগুলি ন্যূনতম ব্যবহার করে সেগুলি বেশি উপভোগ করতে পারি। নিজেদের অনাবশ্যক প্রয়োজনগুলিকে কমিয়ে জঞ্জাল এবং প্রদূষণ উভয়ই কম করতে পারি। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য আমাদের প্রকৃতির কাছে যেতে হবে, প্রকৃতির থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আমরা নিজেদের সভ্য, শিক্ষিত ভেবে আত্মগরিমায় ভুগি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত

হলে গর্ববোধ করি। বাস্তব সত্য হলো— তথাকথিত সভ্য, প্রযুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দেশগুলিই পৃথিবীর এই পরিস্থিতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির নামে তারা পরিবেশ এবং পৃথিবীর সংসাধনগুলি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে চলেছে। এরপর যখন দূষণের প্রশ্ন উঠেছে, তারা অঙ্গুলিনির্দেশ করছে বিকাশশীল দেশগুলির প্রতি। একদিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির নামে পরিবেশ দূষণ, অপরদিকে চলছে ভারতের মতো প্রাচীন দেশের বিশাল যুবসমাজের মগজ ধোলাই-এর আপ্রাণ চেষ্টা। তাদের ব্যবসার সাফল্যের জন্য যুবসমাজের খাদ্য, পোশাক, জীবনযাত্রা সবকিছুকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। অথচ আমাদের সংস্কৃতি পৃথিবীকে 'মা' সম্বোধন করতে শিখিয়েছে। মহাকাশের চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে আমরা আত্মীয়তায় সম্বন্ধ পাতিয়েছি। নিম, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় গাছকে ঈশ্বরের নিবাস বলে মেনে চলেছি। জন্তু-জানোয়ারেরা আমাদের দেবদেবীর বাহন। তাদের ক্ষতিসাধন করা পাপ মানা হয়ে থাকে। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের নানা অঞ্চলে জঙ্গলকে পবিত্র মানা হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে এখনও পর্যন্ত কিছু বনাঞ্চলকে আমরা দেবতার সাক্ষাৎ বিচরণক্ষেত্র মেনে থাকি। সেইসব অঞ্চলে সাধারণ মানুষ প্রবেশ করে না। গাছের পাতা শুকনো ডালও স্পর্শ করে না।

এইভাবে প্রকৃতিকে আদিমকাল থেকে সংরক্ষণ করে চলেছি আমরা। উত্তরে কাশ্মীর হিমাচল থেকে শুরু করে কেরল পর্যন্ত এই ধরনের মানসিকতার প্রমাণ আজও আমাদের কাছে আছে। রাজস্থানের বিশনোই সম্প্রদায়ের প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতার নিদর্শন আমরা সংবাদ মাধ্যমগুলির মাধ্যমে বারবার জানতে পারি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষদের প্রকৃতির প্রতি সমর্পণভাব আমাদের বিস্মিত করে। সুতরাং, একথা প্রমাণিত যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিবেশ দূষণ দূরের কথা, এখানে আছে কেবল প্রকৃতি-পূজন। প্রকৃতিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা। প্রকৃতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করাই আমাদের দিনচর্চার প্রথম শিক্ষা। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সমুদ্র— সবাই আমাদের কাছে প্রণম্য। সেজন্য পাহাড় পর্বতকে আমরা প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণের বিচরণক্ষেত্র গোবর্ধন পর্বতে পা-নয়, মাথা রাখি আমরা। জলাশয়, নদী-নালার জল ব্যবহারের আগে তা মাথায় নিই। আমাদের এই সংস্কৃতিতে ধরিত্রী আমাদের কাছে মাতৃসমান। সেজন্য, আসুন আজকের পৃথিবীর এই বিষম স্থিতিতে আমরা ফিরে যাই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে। কনফারেন্স- সেমিনার করে সাফল্য আসবে না, প্রকৃতি রক্ষাকে আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ মেনে চলতে হবে—তবেই আসবে সাফল্য। প্রকৃতি আর নারী খুবই নিকট।

সেজন্য এই কাজে মহিলাদের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আসুন, আমরা আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা করে আগামী প্রজন্ম এবং জনসাধারণের মধ্যে জাগরুকতা আনার চেষ্টা করি। কারণ পৃথিবীর প্রতি আমরা সবাই দায়বদ্ধ। এই পৃথিবী আমাদের সবার। ■

গরমকালে চর্ম রোগ

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

গরমকালে চর্মরোগ একটি সাধারণ সমস্যা। ঘামাচি তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে ফোঁড়া। ফোঁড়া বিষিয়ে গেলে মারাত্মক ব্যাপার হয়। এই লেখায় তাই ফোঁড়া নিয়ে আলোচনা করব। দেখে নেব ফোঁড়ার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির নিদান কী।

কমবেশি ফোঁড়া প্রায় সব মানুষেরই হয়ে থাকে। ফোঁড়া খুবই বেদনাদায়ক। শরীরের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে ত্বকের উপরিভাগে ফোঁড়া হয়। এছাড়া বগলে, কুচকিতে, যোনিপথের বাইরে ফোঁড়া হতে দেখা যায়। ফোঁড়া মাথার ত্বক, টনসিল, দাঁতের মাড়ি প্রভৃতি জায়গায় হতে পারে।

● ফোঁড়া কী :

শরীরের কোনও অংশে সংক্রমণের কারণে যদি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পুঁজ জমা হয়, তখন তাকে ফোঁড়া বলে। ফোঁড়ার চারপাশের ত্বক গোলাপি বা লালচে বর্ণের হয়।

● কারণ :

ফোঁড়া প্রায়শই ব্যাকটেরিয়া স্টেফাইলোকক্কাস (Staphylococeus Aureus) অরিয়াস দ্বারা সৃষ্ট। এরা ত্বকের পৃষ্ঠতলে অন্যান্য ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। চুল গুটিকা (Hair follicle) সংক্রমণ এটিকে নষ্ট করে এবং অধীনস্থ ফলিকল ও টিস্যুর গভীরে আক্রান্ত করে।

● লক্ষণ :

□ ফোঁড়া স্পর্শকাতর, গোলাপি, গোলাপি লাল, চামড়ায় ফোলা, দৃঢ় এলাকা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি জল ভরা বেলুন বা আমের মতো মনে হয়।

□ এতে পুঁজ এবং মৃত টিস্যু মিলিত হয়ে ব্যাথা হয়। ফোঁড়া থেকে পুঁজ নির্গমণ হলে ব্যথা কমে যায়।

□ ফোঁড়ার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে জ্বর, বমি বমি ভাব, বমি করা, ব্যথা এবং ত্বক লালবর্ণ হওয়া প্রভৃতি হতে পারে।

● প্রতিরোধ :

□ সাধারণত জল ব্যবহার করে নিজেকে সব সময় পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

□ দাড়ি কাটার সময় যেন ত্বকের কোনও অংশ কেটে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

□ নিজে নিজে ফোঁড়া কখনোই ফাটানো যাবে না। এর ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে যেতে পারে।

□ কোনও ক্ষতের সৃষ্টি হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

● কাদের ফোঁড়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি আছে :

যাদের ডায়াবেটিস, ক্যান্সার আছে, যাঁরা কিডনি ডায়ালেসিস করেন; যাঁদের রক্তনালীর সমস্যা আছে, অন্ত্রনালীতে সমস্যা আছে। এইডস রোগী, যাঁরা মারাত্মক পোড়া, আঘাত পেয়েছেন--- এরকম ব্যক্তিদের ফোঁড়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

● চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী বেলেডোনা, হিপারসালফার, সাইলেশিয়া, ল্যাকেসিস প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

বুদ্ধশিষ্যের স্মৃতিরক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ

প্রণব দত্তমজুমদার

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও যোগমায়া দেবীর দ্বিতীয় পুত্র কিন্তু তৃতীয় সন্তান ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। স্যার আশুতোষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারক। ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতার ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম হয়। তিনি ছোট থেকেই খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে স্কলারশিপ পেয়ে পাশ করেন। তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট হয়ে বিএ পাশ করেন ১৯২১ সালে। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট হয়ে বাংলায় এমএ পাশ করেন এবং ১৯২৪ সালে বিএল পরীক্ষায় ফার্স্ট হন। ১৯২৪ সালে স্যার আশুতোষের মৃত্যু হয়। ১৯২৫ সালে তিনি ইংল্যান্ড যান ব্যারিস্টারি পড়তে এবং ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বাপ কা ব্যাটা। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই, এমএ বি এল পাশ করার পর, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট নির্বাচিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর একজন সদস্য হয়ে যান এবং তারপর মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। এত কম বয়সে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যখন ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠেছিল তখন ব্রিটিশ সরকার ঠিক করল আমাদের দেশের লোকেদের কিছু ক্ষমতা দেবে—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের দেশের নির্বাচিত নেতারাই শাসন করবেন ব্রিটিশ ক্রাউনের অধীনে থেকে। সেইমতো ১৯৩৭ সালে, ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশে নির্বাচন হয়। আমাদের বাংলায় দুটি মুসলিম দল—মুসলিম লিগ এবং কৃষক প্রজা পার্টি মিলে সরকার গঠন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হক। মুসলিম লিগ দলটি ছিল ভীষণ সাম্প্রদায়িক। ক্ষমতা পেয়ে তারা ইসলামিক রাষ্ট্র ''পাকিস্তান'' গঠন করার লক্ষ্যে ঘুঁটি সাজাতে লাগল। বিশেষ করে পূর্ববাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণে হিন্দুদের উপর মারদাঙ্গা আরম্ভ করল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Constituency থেকে শ্যামাপ্রসাদ বাংলার প্রাদেশিক সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মুসলিম লিগের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য না হওয়ার দরুন বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারছিলেন

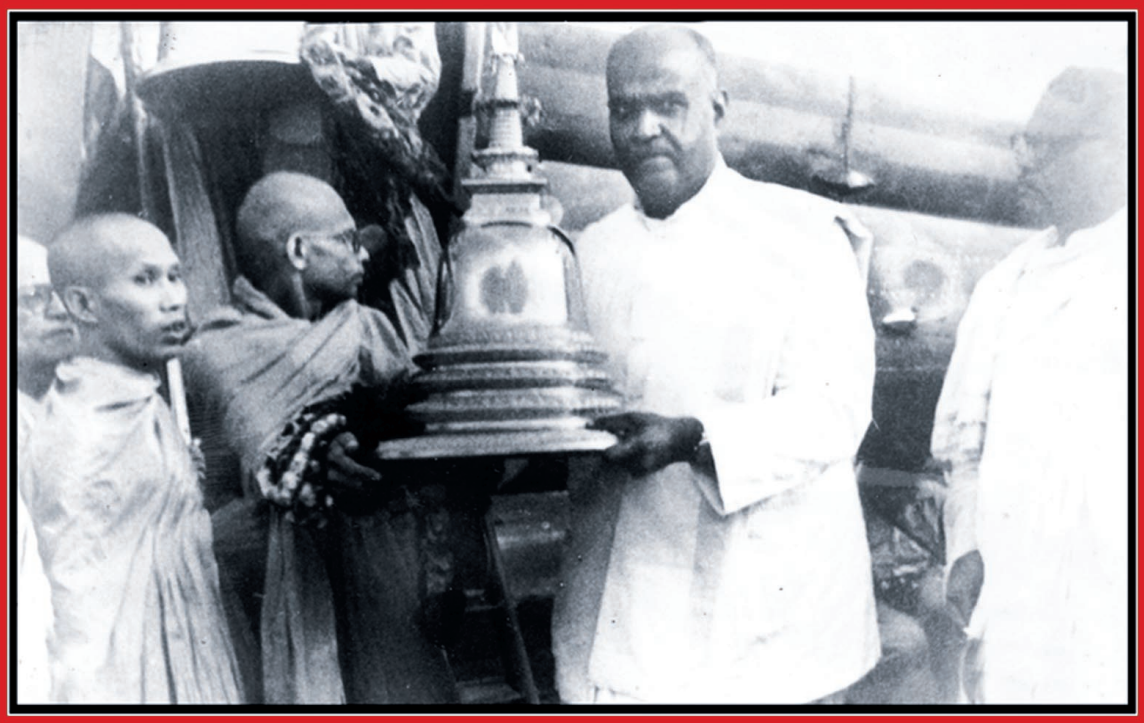

বুদ্ধশিষ্যের দেহাবশেষ হাতে শ্যামাপ্রসাদ।

না শ্যামাপ্রসাদ। মুসলমান তোষণের কারণে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টি মুসলিম লিগের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কোনও সক্রিয় বিরোধিতা গড়ে তোলেনি।

১৯৪০ সালে শ্যামাপ্রসাদ, স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এবং বীর সাভারকারের অনুপ্রেরণায় 'হিন্দুমহাসভা' দলে যোগ দেন এবং তার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন। এদিকে মুসলিম লিগের নেতা জিন্নার সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হকের বনিবনা হচ্ছিল না। শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪১ সালে রাজনৈতিক কৌশল করে মুসলিম লিগকে সরিয়ে দিয়ে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করেন এবং মুসলিম লিগের আগ্রাসন থেকে হিন্দুদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। এই সরকারে তিনি অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এ কে ফজলুল হক। ফজলুল হকের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের সুসম্পর্ক ছিল। এই সরকার 'শ্যামা-হক সরকার' নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজরা এই 'শ্যামা-হক সরকার'কে ভালোভাবে নিল না। ইংরেজরা মুসলিম লিগকে বেশি পছন্দ করত, কারণ মুসলিম লিগ কোনওদিনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। এই 'শ্যামা-হক' সরকারকে অবশ্য ইংরেজরা ছল করে ভেঙে দিয়েছিল এবং পুনরায় মুসলিম লিগকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল।

পরে ১৯৪৬ সালে বাংলায় আবার নির্বাচন হয়। এবার মুসলিম লিগ একক গরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠন করে। এবারও শ্যামাপ্রসাদ বাংলার প্রাদেশিক সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদিকে, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্বের রাজনীতি এবং আমাদের দেশের রাজনীতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছল যে, ইংরেজরা উপলব্ধি করল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কাজ করার জন্য ১৯৪৬ সালের মার্চে ক্যাবিনেট-মিশন আসে ভারতবর্ষে।

মুসলিম লিগ এর নেতা ছিলেন মোহম্মদ আলি জিন্না। তিনি ১৯৪০ সাল থেকেই ঘোষিতভাবে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান চেয়ে আসছিলেন। তিনি এবারও বললেন স্বাধীনতা দেওয়ার সময় দেশ ভাগ করে পাকিস্তান দিতে হবে। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এইসব দলের নেতারা ভারত ভাগ করতে চাইছিলেন না। তখন মুসলিম লিগের লোকেরা পাকিস্তান আদায় করবার জন্য ভীষণ দাঙ্গা করেছিল। আসলে এই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ছিল ইসলামিক দেশ পাকিস্তান বানাবার জন্য মুসলিম লিগের 'জিহাদ'। ওইসময় হাজার হাজার হিন্দুদের ওরা হত্যা করেছিল, হাজার হাজার হিন্দু নারীদের সম্মান নষ্ট করেছিল, হাজার হাজার হিন্দুর বাড়ি লুঠ করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। হাজার হাজার হিন্দুর ধর্মান্তরিত করেছিল। শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর দল হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের এইসব জঘন্য কাজের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। অবশেষে মুসলিম লিগের চাপের কাছে সবাইকে হার মানতে হলো। ঠিক হলো দেশ ভাগ হবে। মুসলমান গরিষ্ঠতা থাকার কারণে জিন্না অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের মধ্যে ঢোকাতে চাইলেন। শ্যামাপ্রসাদ তীব্র বাধা দিলেন। তিনি বললেন বাংলাকে দুভাগ করে, হিন্দু অধ্যুষিত অংশকে বাঙালি হিন্দুদের জন্য রাখতে হবে, না হলে মুসলিম লিগের হাতে হিন্দুরা বাঁচতে পারবে না। একইভাবে শিখদের জন্যও পাঞ্জাবের একটি অংশের ভারতভুক্তির তিনি দাবি করেছিলেন। তাঁর তীব্র আন্দোলনের ফলে বাংলা দুভাগ হল— পূর্ববঙ্গ (যেটা এখন বাংলাদেশ) সেটা পাকিস্তানে গেল, আর 'পশ্চিমবঙ্গ' ভারতে এল এবং বাঙালি হিন্দুদের সুরক্ষিতভাবে থাকার জায়গা হলো। পরে মুসলমানদের অত্যাচারে প্রায় দেড় কোটি হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল। অনুরূপভাবে পাঞ্জাবও ভাগ হয়ে একটি অংশ ভারতভুক্ত হল। শ্যামাপ্রসাদ ওইরকম জানপ্রাণ দিয়ে না লড়াই করলে এইসব হিন্দু ও শিখরা প্রাণ বাঁচাতে কোথায় যেত?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হল। 'পশ্চিমবঙ্গের' জন্য লড়াই করে শ্যামাপ্রসাদ এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের নেতারা তাঁকে মনোনীত করে ভারতবর্ষের সংসদে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে স্বাধীন ভারতবর্ষের শিল্পমন্ত্রী করা হয়েছিল। তিনি শিল্পমন্ত্রী হয়ে ভারতবর্ষের শিল্পের উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদের এইসময়ের একটি উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলব। যে কাজটি ছিল একটি অরাজনৈতিক কাজ এবং যার মধ্য দিয়ে তাঁর মানসিক গুণের উজ্জ্বল দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। এটি ১৯৪৯ সালের ঘটনা। ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রতিষ্ঠান, কলকাতায় অবস্থিত 'মহাবোধি সোসাইটি'। ওইসময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও ডঃ মুখার্জির জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা কতটা ছিল এথেকেই অনুমান করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতি এবং দর্শন সম্পর্কে খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ডঃ মুখার্জি। এই পদপ্রাপ্ত হয়ে একজন আলঙ্কারিক ব্যক্তি হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেন না শ্যামাপ্রসাদ। বরং চাইলেন একজন মানবতাবাদী ব্যক্তির মতোই গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে। ভারতবর্ষের প্রাণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনার এটিও একটি ধারা। হিন্দুধর্ম বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার হিসেবে মেনে নিয়েছে। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক দর্শনের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে নতুন স্বাধীন হওয়া ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মেলবন্ধন ঘটাতে চাইলেন। তাঁর মনের কোণে হয়তো তখন অনুরণিত হচ্ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সেই বিখ্যাত মন্ত্র— বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি।

ভগবান বুদ্ধ যেন তাঁর মনের কথা টের পেলেন। তা না হলে এরকম অদ্ভুত এক সুযোগ কী করে সেইসময়ই এসে গেল তাঁর জীবনে। ঘটনাটা এইরকম—বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্য ছিলেন সারিপুত্র ও মহামজ্ঞাল্লানা। অনেক বৌদ্ধ মন্দিরে দেখা যায় বুদ্ধের ডান দিকে সারিপুত্র এবং বাঁ দিকে মহামজ্ঞাল্লানার মূর্তি। এঁদের মাধ্যমেই বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষা, প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। সারিপুত্র এবং মহামজ্ঞাল্লানা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের লোকেদের আদিগুরু। এঁদের পূত পবিত্র দেহাবশেষ প্রায় দুহাজার বছর ধরে রক্ষিত ছিল সাঁচিস্তূপে (মধ্যপ্রদেশে)। ১৮৫১ সালে ইংরেজ জেনারেল কানিংহাম সেই পূতপবিত্র দেহাবশেষ ইংল্যান্ডে নিয়ে যান এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখার ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে ব্রিটিশ সরকার তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজীর হাতে অর্পণ করে। ১৯৪৯ সালের ১৪ জানুয়ারি কলকাতা ময়দানে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজী মহাবোধি

দেহাবশেষ প্রত্যার্পণ অনুষ্ঠানে ড. রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ।

সোসাইটির সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হাতে তা অর্পণ করেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ প্রায় দুহাজার বছর ধরে রক্ষিত (তার মধ্যে কত সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে) তাঁদের আদি গুরু সারিপুত্র ও মহামঞ্জাল্লানার পূত পবিত্র দেহাবশেষ।

শ্যামাপ্রসাদ ঠিক করলেন এই অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদকে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জুড়ে যেসব দেশে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ আছেন তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের দর্শনের সুযোগ করে দেবেন। আর এর ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ওইসব দেশগুলোর একটি আত্মিক সংযোগ তৈরি হবে। তদুপলক্ষে তিনি বার্মা (মায়ানমার), শ্রীলঙ্কা, ফ্রেঞ্চ ইন্দোচায়না, কম্বোডিয়া, তিব্বত, ব্যাঙ্কক, ইত্যাদি দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মের মানুষজনকে তাঁদের আদিগুরুর পূত পবিত্র দেহাবশেষ দর্শন করিয়ে অবশেষে তা আবার সাঁচিতে এনে নতুন করে তৈরি বৌদ্ধবিহারে পুনঃস্থাপিত করলেন ১৯৫২ সালে, একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন তখনকার ভারতের উপরাষ্ট্রপতি বিখ্যাত দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন।

ওই সমস্ত দেশের লোকেরা এই পূতপবিত্র দেহাবশেষ দর্শনে যেন সাক্ষাৎ ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর প্রিয় শিষ্যদ্বয়ের দর্শনের স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেছিলেন। তাঁরা শ্যামাপ্রসাদকে ধন্য ধন্য করলেন; এমনকি বার্মাতে তো লোকেরা তাঁকে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলেই মনে করেছিলেন। ভেবেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্ম বিষয়ে তাঁদের আলোকিত করতে তাদের কাছে এসেছেন। কম্বোডিয়াতে বিমান বন্দর থেকে 'সিলভার প্যাগোডা' পর্যন্ত যাবার পথে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে এক লক্ষেরও বেশি জনতা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বার্মার প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন—'আপনি জানেন না কী মহান কাজ আপনি করলেন। এই পূত পবিত্র দেহাবশেষ নিয়ে আসার ফলে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। তাঁরা যেন তাদের আত্মার সন্ধান পেয়েছে।' এইভাবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মানুষের মন ও হৃদয় জয় করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। আসলে যে কাজটাই করতেন সেটাই মনপ্রাণ দিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে করতেন।

কিন্তু দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ তিনি বেশি দিন পেলেন না। স্বাধীনোত্তর সময়ের নোংরা রাজনীতির আবর্তে পরে কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার পুলিশের হাতে বন্দি হন তিনি। তারপর বন্দী অবস্থায় অসুস্থ হয়ে ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন কাশ্মীরে মারা যান। অনেকে মনে করেন শ্যামাপ্রসাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি—নেহেরুজী ও শেখ আবদুল্লার চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন তিনি। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর তদন্ত দাবি করেছিলেন কিন্তু নেহেরুজী করাননি। আর আমরা অকৃতজ্ঞ বাঙালি যারা তাঁর জন্যই 'পশ্চিমবঙ্গ' পেয়ে সেখানে মান-সম্মান নিয়ে বসবাস করছি (না হলে ইসলামিক বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কায় দিন কাটাতে হতো) তাঁকে কতটুকুই বা মনে রেখেছি, কতটুকুই বা সম্মান জানাচ্ছি।

তথ্য সূত্র ঃ

১. The Life and Times of Dr. Shyamaprasad Mookherjee - by Tathagata Roy.
২. বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ।

পাহাড়ের কোলে লাল ঝামেলা

ব্রততী ঘোষ

বেশ বড়সড় একটা পাথর। সেটাই নাকি সীমান্তরেখা ভারত-ভুটানের। ভারতের পাহাড়ি রাস্তা শেষ হলেই খাদ। নীচে বহতা ডায়না নদী আর তার গা ঘেঁসে ভুটান পাহাড়। কাঁটাতার বা প্রাচীর দিয়ে প্রকৃতির এই সীমারেখা ফ্রেম করা যায় না। দুই দেশের সরকার আর কী করে? অগত্যা এই পাথর। ঘাস খেয়ে জাবর কাটতে কাটতে ওদেশ থেকে গোরু এদেশে ফেরে। সব পাখি ঘরে আসে সেও ওদেশ থেকে। অদ্ভুত সীমারেখার এই জায়গাটির নামও ভারি অদ্ভুত— 'লাল ঝামেলা।'।

লাটাগুড়ি ফরেস্টের অনতিদূরে ভারত-ভুটানের প্রায় অনাবিষ্কৃত স্থানটির ঘোর কাটতে সময় লাগে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের থাকার জন্য লোকসান চা বাগানের নিকট এই স্থানটি সংরক্ষিত ছিল। ভারত সরকারের সেই কার্যক্রম বলবত না হওয়ায় ধরনিপুর চা বাগানের মালিক জায়গাটিকে নিজের মালিকানায় আনার চেষ্টা করেন। ঝামেলার সূত্রপাত সেখান থেকেই। স্থানীয়ও অধিবাসীরা তাতে প্রবল বাধা দেয়। অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন দুই বৃদ্ধ। কাকতালীয় ভাবে দুজনের নামই সোমরা ওঁরাও। এদের একজন তিরন্দাজ। তির বা বল্লম দিয়ে লাল রক্ত ঝরিয়ে বিপক্ষকে আক্রমণ করতেন বলে তাঁর নাম হয় লাল সোমরা ওঁরাও। অন্যজন যুদ্ধবিদ্যায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না তবে প্রবল ঝামেলা পাকিয়ে জমি আঁকড়ে রাখতেন। অতএব তিনি ঝামেলা সোমরা ওঁরাও। অবশেষে লোকসান চা বাগানের দলবল রণে ভঙ্গ দেন। জয়ী হয় স্থানীয় বাসিন্দারা। যাদের প্রচেষ্টা ছাড়া এই যুদ্ধ জয় অসম্ভব ছিল তাদের সম্মান জানাতে জায়গার নাম লাল ঝামেলা। যে কোনও ব্যবসার উদ্দেশ্য থাকে ব্যবসায় লাভবান হওয়া। কিন্তু চা বাগানের নাম লোকসান কেন? কথিত এক ব্রিটিশ সাহেব মিঃ রবিনসন-এর অনেক বাগানগুলির মধ্যে লোকসান অন্যতম। ওয়ান ফাইন মর্নিং চা বাগানের সূর্যোদয় দেখে সাহেব মেমসাহেবকে বলেছিলেন— 'লুক দ্য সান' সেই থেকে চা বাগানের নাম লোকসান।

ওই ছোট্ট জায়গাটিতে হোম স্টে করতে পারেন। ভারত- ভুটানের ঝুলন্ত সেতু পার হতে চাইলে ভোটার আই ডি আবশ্যক। স্থানীয় লজের কাউকে নিয়ে যেতে হয়। অচিরেই তাদের ওপারে যাবার অনুমতি মেলে। কটেজ মালিক উত্তমদার কথায় 'বন্ধু দেশ তো ডিউটি করতে করতে সিগারেট বা জল শেষ হলে আমরাই তো সরবরাহ করি। কতক্ষণ আর ওই নির্জনে একা একা ডিউটি করা যায় বলুন তো?' দুই দেশের মাটিকে ছুঁয়ে থাকা ঝুলন্ত ব্রিজ, নিচে বহতা ডায়না নদি, ওপ্রান্তে ভুটান পাহাড়। পৃথিবীময় নীল সবুজের ক্যানভাসে ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়ালে জগত ভুলে থাকা যায়। ডায়না নদীর গর্জনের অনুরণন শোনা যায় কলকাতায় ফিরে এসেও। সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ঠাহর করা মুশকিল কোন দেশের সূর্যাস্ত দেখলাম।

সূর্যোদয় দেখতে চাইলে কটেজের ছেলেরা গরম চায়ের কাপ হাতে ডেকে দেবে সময় মতো। বারান্দায় বসে এপ্রিলের শীতেও আপনার তখন ঘোর লাগা অবস্থা। খাবার সময় অতিথিপরায়ণ উত্তমদাকে দেখে অবাক হয়েছিলাম খুব। গৃহস্থ বাড়ির মনিব যেন কোনও নিমন্ত্রিত অতিথিদের যত্ন করে খাওয়াছেন। বারান্দায় বসে লাঞ্চ করতে করতে ভুটান পাহাড়ের বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি দৃশ্যমানও হলো। কিন্তু হায়, সে আর ভারতে ঢুকল না। খুব ইচ্ছে ছিল ডায়না নদীর অবহাহিকায় বৃষ্টি ভেজার। কী জানি ভুটান সরকার হয়তো ভিসা দেয়নি। এ ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিলাম। খাবার একটু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল ঝড়ো হাওয়ার দাপট। প্রায় ৮০ মাইল বেগে হাওয়ার দাপটে চেয়ার, টেবিল উল্টে পড়তে লাগল পটাপট। ধুলোবালি উড়ছে না এক ফোঁটাও। পরিষ্কার আকাশে এ কোন অকালবৈশাখী? খাবার পর বিছানায় একটু গড়াগড়ি। বিকেল বেলায় হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ালাম ডায়ানা নদীর খাদের ধারে। স্থানীয় কিছু ছেলেপুলে মাছ ধরছে। ডুয়ার্সের প্রায় সব নদীতেই এখন চলছে এক অদ্ভুত মাছ ধরার প্রক্রিয়া। ব্যাটারি চালিত কারেন্ট দিয়ে এরা মাছ ধরে। যেটুকু জায়গা পর্যন্ত কারেন্টের বিস্তৃতি সেইটুকু জায়গার মাছ তো মরেই উপরন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার অপরিহার্য জলজ প্রাণীদেরও প্রাণ নাশ হয়। ভাগ্যক্রমে যে মাছ বেঁচে যায় তাদের আর প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থা

চললে অচিরেই বিপদের সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই বোরোলি মাছের কিলো হাজার টাকা ছাড়িয়েছে।

ডুয়ার্সবাসীদের এ নিয়ে তো কোনও হেলদোল দেখা গেল না। অথচ এর পরিণতি সবার কাছেই খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার। লিস, ঘিস, আংরাভাসা সব নদীরই একই চিত্র। একই চিত্র উদ্বেগহীন মানুষজনেরও।

চারপাশের আলো কমে আসছে ধীরে ধীরে। সন্ধ্যে নামছে বকের পাখায়। হাজার পাখি ঘরে ফিরছে। খাদের পাশে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বকের দল। মাঝে মঝেই আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছিল। যে স্ট্রোকে ওরা আসছিল আমার মাথামুণ্ডু এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতেই পারত অনায়াসে। ওদের পাখার ছটফটানি আমার কানে, পাখার হাওয়া আমার গায়ে... ঘোর লাগা অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। কটেজে ফিরে আসতেই শুরু হলো ঝিঁঝিঁর কনসার্ট। সেটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করে ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করা হলো। চায়ের সঙ্গে টা অর্থাৎ ফুলকপির গরম পকোড়া এক কথায় অসাধারণ। অনতিদূরে ভুটান পাহাড়ের আলো জ্বলছে। কটেজ থেকে মনে হচ্ছে জোনাকি ঘরে ফেরার পথ খুঁজছে। নিস্তব্ধ চরাচরে নদীর গর্জন আরও তীব্র মনে হয়। রাতে মুসুরির ডালের গরম খিচুড়ি। ডিম ও পাঁপড় ভাজা। অনেক রাত পর্যন্ত বসেছিলাম বারান্দায়। পুরো রাতটাই কাটিয়ে দেওয়া যায়। পরদিন ভোরবেলা দরজা খুলতেই আকাশে কমলা আভা। ''আমি চোখ মেললুম আকাশে জ্বলে উঠল আলো'' পঙক্তিগুলির যথার্থতা

বুলন্ত সেতু।

অনুভব করলাম। ব্রেকফাস্ট সেরে কটেজ থেকে বেশ অনেকটা নেমে গেলাম এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে। অশীতিপর বৃদ্ধ বেশ অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু অসম্ভব ব্যক্তিত্ব। ইনি এক সোমরা ওঁরাও। অনেক পুরনো দিনের গল্প করলেন। নুন দেওয়া লিকার চা খাওয়ালেন। ইতস্তত করে প্রশ্নটা করেই ফেললাম। আপনি কোন সোমরা ওঁরাও? নড়বড়ে পায়ে ঘরে গেলেন বৃদ্ধ। কাঁপা হাতে আমাকে একটা ভোটের পরিচয় পত্র দেখতে দিলেন। আকস্মিক আমাকে কেন এই ভোটের পরিচয় পত্র দেখতে দিচ্ছেন? এ আবার কেমন বৃদ্ধের ছেলেমানুষি? পরিচয় পত্রটি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম নাম— ঝামেলা সোমরা ওঁরাও। বিস্মিত ভাবে ওঁর দিকে তাকাতে হাসলেন। সেই হাসি ফ্রেম করার মতো কোনও কোম্পানির ক্যামেরা আমার কাছে ছিল না। সম্প্রতি খবর পেয়েছি ঝামেলা সোমরা ওঁরাও গত হয়েছেন। ঝামেলা বিহীন লাল ঝামেলা এখন কেমন আছে তার চাবি কাঠি দিলাম আপনাদের হাতে। আপনারা ঘুরে এসে জানান।

কীভাবে যাবেন? লাটাগুড়ি ফরেস্টকে বেসক্যাম্প করে নামতে হয় লোকসান-এ। সেখান থেকে স্থানীয় গাড়িতে ক্যারন চৌপথি। ক্যারন থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে লাল ঝামেলা যাবার বিভিন্ন গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। লাটাগুড়ি থেকে এর দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। এছাড়াও লাটাগুড়ি অথবা চালসা থেকে গাড়ি ভাড়া করে লাল ঝামেলায় পৌঁছনো যায় অনায়াসেই।

কোথায় থাকবেন? থাকার জায়গা পেয়ে যাবেন প্রকৃতির কোলেই। আছে উত্তমদার ডায়না রিভার ক্যাম্প হোম স্টে। সেখানে সুন্দর দুটি কটেজ আছে। এক দিনের ভাড়া প্রায় ১২০০ টাকার মতো। ডাবল বেড। চাইলে এক্সট্রা গদি পাওয়া যায়। সারাদিনে খাওয়া খরচ জন প্রতি ৫৫০ টাকা। ইচ্ছে হলে সংলগ্ন এলাকা থেকে বাজার করে নিয়ে যেতে পারেন। তাতে কিছুটা সস্তা পড়ে। ■

হোম স্টে।

এই সময়

সহমর্মী

ম্যাক্স নামের কুকুরটির বয়েস ১৭ বছর। চোখে ভালো দেখে না, কানেও একটু খাটো। কিন্তু

মনটা তার বড়ো। অরোরা বলে একটি মেয়ে কুকুর হারিয়ে গিয়েছিল। ম্যাক্স তাকে দেখতে পায়। তারপর স্থানীয় থানায় নিয়ে আসে। অরোরা আপাতত ভালোই আছে।

ধীরে বৎস

লন্ডনে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে আসন্ন ম্যারাথন দৌড়

প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের জোরে দৌড়তে নিষেধ করা হয়েছে। প্রতিযোগীরা যাতে ফ্যান্সি পোশাক না পরেন সে ব্যাপারেও অনুরোধ করা হয়েছে। এখন লন্ডনের তাপমাত্রা ২৩° সেলসিয়াস।

রসিকতা

ভিডিওটি দেখলে হাড়হিম হয়ে যাবে। চীনে একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে এক মহিলা তাঁর বন্ধুকে বাসের নীচে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছেন। সৌভাগ্যবশত বন্ধুর

কোনও ক্ষতি হয়নি। ঠাট্টার ছলে এরকম করেছেন, জানিয়েছেন ওই মহিলা।

সমাবেশ -সমাচার

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান

'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান' এবছর ড. কমলকিশোর গোয়েঙ্কাকে প্রদান করা হলো। গত ১৫ এপ্রিল কলকাতায় অসওয়াল ভবনে আয়োজিত এক কার্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ড. গোয়েঙ্কাকে এই সম্মানে ভূষিত করে তাঁর হাতে মানপত্র, শাল ইত্যাদি তুলে দেন। ড. গোয়েঙ্কা সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি সাহিত্যিক প্রেমচন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত। শ্রীবড়বাজার কুমারসভার উদ্যোগে এই নিয়ে ভারতের ২৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান প্রদান করা হলো। রাজ্যপাল শ্রীত্রিপাঠী বলেন, সাহিত্য ইতিবাচক হওয়া উচিত। কোনও বিতর্কিত বিষয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে কল্যাণকর নয়। মানসিক দুঃখকষ্ট ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু জাতি যখন সংকটগ্রস্ত হয়, তখন তা সমাধানের জন্য ডাঃ হেডগেওয়ারের মতো রাষ্ট্রভক্তের জন্ম হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অবনিজেশ অবস্থী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ব্রজকিশোর শর্মা। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, প্রবীণ ব্যবহারজীবী (আয়কর) সজ্জন কুমার তুলসীয়ান, বিমল লাট, লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা প্রমুখ। এদিন হিন্দি সাহিত্যিক পদ্মশ্রী ড. কৃষ্ণবিহারী মিশ্রকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। ড. আশা ত্রিপাঠির 'রামায়ণ মে রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থটির উন্মোচন করেন রাজ্যপাল।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জানান মহাবীর বাজাজ।

প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন

গত ৮ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রেশিমবাগে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতিস্থলে মাধব ভবনের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের সংগঠনটি এবার থেকে 'বরিষ্ঠ নাগরিক পরিসঙ্ঘ' নামে পরিচিত হবে। সংগঠনটির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হাঁসুভাই দাভে। সহ-সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন পশ্চিমবঙ্গের বিএমএসের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমানে 'প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ অব বেঙ্গল'-এর রাজ্য সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন মহারাষ্ট্রের বিএমএসের আর এক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নেতা বসন্ত

এই সময়

ক্যাঙারুর লাফ

চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের ফুজহাউ চিড়িয়াখানায় দর্শকদের ছোঁড়া ইটের আঘাতে

একটি ক্যাঙারুর মৃত্যু হয়েছে। অন্য একটি মারাত্মক আহত। বিশ্রামরত ক্যাঙারুর লাফ দেখার জন্য ইট ছোঁড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। গ্রেপ্তার চারজন।

পিতাপুত্র সংবাদ

হায়দরাবাদের জি ভি প্রসাদ এবং তাঁর ছেলে রক্ষিত মে মাসের গোড়ায় এক অভিনব বাইক যাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। তাদের দলটি মোট

ছ'জনের। তারা গুয়াহাটি থেকে লন্ডন যাবেন। পঞ্চান্ন দিনের এই যাত্রায় তাঁরা ষোলটি দেশ অতিক্রম করবেন।

ভোটার কার্ডে বিয়ে

কর্ণাটকে ভোটের আর বিশেষ দেরি নেই। সবাই

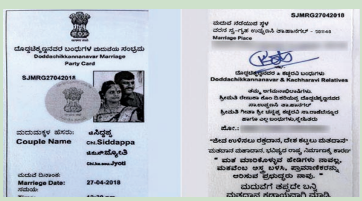

যাতে ভোট দেন তার জন্য কর্ণাটকের সিদাপ্পা তার বিয়ের কার্ডটি তৈরি করেছেন ভোটার কার্ডের আদলে। সিদাপ্পা জানিয়েছেন বিয়েতে তিনি নতুন কিছু করতে চেয়েছিলেন। সেই চাওয়ারই ফল এই অভিনব বিয়ের কার্ড।

সমাবেশ -সমাচার

পিমপালাপুরেজী। সঙ্ঘের চিরকালীন আদর্শে লালিত ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ পরিচালিত এই বরিষ্ঠ নাগরিক পরিসঙ্ঘ শপথ গ্রহণ করেছে— ''আমরা উপেক্ষিত থাকতে চাই না। আমরা চাই রাষ্ট্রের সেবায় সতত নিয়োজিত থাকতে। আমরা রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে বাঁচতে চাই না। চাই রাষ্ট্রের সম্পদ হয়ে চিরভাস্বর থাকতে। এটা সম্ভব হবে সেদিনই যেদিন অনুভবী, চিন্তাশীল প্রবীণ নাগরিকগণ এই কাজে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। তাই সঙ্ঘ আদর্শে শিক্ষিত প্রবীণ নাগরিকগণের কাছে তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ফোন নম্বরে যোগাযোগের জন্য জানিয়েছেন। নারায়ণ চন্দ্র দে— ৯৪৩৩৯০৪২৪৪/৮২৪০৯৫৩৭১৭।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্য শিল্পের বার্ষিক প্রদর্শনী

গত কয়েক বছরের মতো এবছর ১৯ মার্চ কলকাতায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল। উদ্যোগ ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ফ্যাকাল্টি অব ভিজুয়াল আর্টস। এই প্রদর্শনীতে ১৮৫ রকমের শিল্পসামগ্রী— চিত্র, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স, ব্যবহারিক শিল্প, কল্যাবিদ্যার ইতিহাস প্রভৃতি স্থান পেয়েছিল। মোট ২৮ জন ছাত্রকে তাদের কলাকৃতির জন্য পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটির উদ্‌বোধন করেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সাংসদ যোগেন চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী, রেজিস্টার দেবদত্ত রায়, ফ্যাকাল্টির ডীন আদিত্য প্রসাদ মিত্র প্রমুখ।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলার মুন্সীরহাট শাখার স্বয়ংসেবক দেবাশিস দীর্ঘাঙ্গী তাঁর পুত্র আদিত্য দীর্ঘাঙ্গীর পঞ্চমবর্ষ জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতিভোজসভায় সমাজের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য মঙ্গলনিধি স্বস্তিকার ছাত্রবৃত্তি কোষে প্রদানের জন্য সম্পাদক বিজয় আঢ্যর হাতে সমর্পণ করেন। তাঁর মাতৃদেবী-সহ পরিবারের পক্ষেই এই সমর্পণ করা হয়।

* * *

গত ৭ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুরের চমকরাম গ্রামের ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের সদস্য মদনমোহন দে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শুভেন্দু দে-র শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা প্রচারক বরুণ ঘোষের হাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ প্রান্তের সদ্‌ভাবনার প্রমুখ সনাতন মাহাতো ও মেদিনীপুর বিভাগের সম্পর্ক প্রমুখ নিত্যানন্দ দত্ত।

এই সময়

সৈনিক স্কুলে মেয়েরা

সাতান্ন বছরে এই প্রথম। উত্তরপ্রদেশের সৈনিক স্কুলের দরজা মেয়েদের জন্য খুলে দেওয়া

হলো। লক্ষ্ণৌয়ের সৈনিক স্কুলে ১৫ জন মেয়েকে ক্যাডেট বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। যেসব মেয়েরা দেশের জন্য কিছু করতে চান, ভাবা হয়েছে তাদের কথাই।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপি

ঝাড়খণ্ডের পাঁচটি পৌরসভাই জিতে নিল বিজেপি। ১৩টি নগর পঞ্চায়েতের মধ্যে জয়

এসেছে ৯টিতে। ১৬টিতে পুর কাউন্সিলের মধ্যে জয় এসেছে সাতটিতে। এমনকী ঝুমরি তালাইয়া নগরের উপনির্বাচনেও জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী।

বন্ধুত্বের ফুটবল

প্রত্যেকবার ফিফা বিশ্বকাপের আগে ফুটবল ফর ফ্রেন্ডশিপের আয়োজন করে। সারা বিশ্বের

বিভিন্ন দেশের কিশোর প্রতিভাদের নিয়ে তৈরি হয় দল। এবার ফুটবল ফর ফ্রেন্ডশিপের দলে সুযোগ পেয়েছে ভারতের দুই প্রতিভা সূর্য ভারিকুটি এবং রুদ্রেশ গাউডনার।

সমাবেশ -সমাচার

দিল্লি পুলিশের মানবিক মুখ

তিন হাজার নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধার করে তাদের মুখে হাসি ফোটাল দিল্লি পুলিশ। মাত্র চার দিনে তারা এই অসাধ্যসাধন করেছেন। কাজে লাগানো হয়েছে ফেসিয়াল

রেকগনিশন সিস্টেম নামের এক নতুন ডিজিটাল পদ্ধতি। কিছুদিন আগে থেকেই দিল্লি পুলিশ এই নতুন অ্যাপ (এফ আর এস) ব্যবহার করা শুরু করেছিল। নিখোঁজ শিশুদের খুঁজে বের করতেই দিল্লি পুলিশের এই উদ্যোগ। নারী এবং শিশু বিকাশ মন্ত্রকের তরফ থেকে বলা হয়েছে, তিন হাজার শিশুকে উদ্ধার করার পর এখন চেষ্টা চলছে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার। এর আগে পুলিশের এই ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করা উচিত কিনা তাই নিয়ে মামলা হয়। দিল্লি হাইকোর্ট পুলিশকে অ্যাপ ব্যবহার করে নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধার করার নির্দেশ দেয়। ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটসের পক্ষ থেকেও সমর্থন জানানো হয়েছে পুলিশের এই উদ্যোগকে।

জুডোয় সোনা

ললিতপুরে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের খেলোয়াড়রা দারুণ ফলাফল করেছে। ভারত পেয়েছে মোট দশটি সোনা। তার মধ্যে মেয়েরা জিতেছে ৭টি আর ছেলেরা তিনটি। পদক জেতার পর ভারতীয় মহিলা জুডোকা জিনা দেবী

বলেন, 'সোনার পদক জিতে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পেরেছি, আর কিছু চাই না।' রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে টুইটবার্তায় বলেন, 'মেয়েদের বিভাগের সাতটি সোনাই আমাদের মেয়েরা জিতেছে শুনে আমি গর্বিত। ছেলেরাও পেয়েছে তিনটে পদক। সব মিলিয়ে ফলাফল যথেষ্ট ভালো।'

মৃত্যুভয় থেকে নিষ্কৃতির জন্য

চূড়ামণি হাটি

‘ভয়ে ভয়ে ভয় দেখা।’ অর্থাৎ মরা দেখা। মৃত্যুভয় ও মৃত্যুর মতো ঘটনা মনকে দুর্বল করে। মানুষ পাথরকে ছুঁচালো করে যেমন অস্ত্র তৈরি করেছে। গুহাচিত্রে পশু বধের দৃশ্য আসলে শিকারে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি। আশা নিয়ে বেঁচে থাকা। মানুষ অভিজ্ঞতা নির্ভর বুদ্ধির উপর যেমন ভরসা রেখেছে; তেমনি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে অদৃশ্য শক্তির সন্ধান করেছে। সৃষ্টি থেকে ধ্বংস সবই শক্তির খেলা। মৃত্যু হলো আত্মার বিদায়। আত্মা হলো শক্তি। শক্তির মৃত্যু নেই। রূপান্তর ঘটে মাত্র। প্রথম থেকেই মানুষ সব কিছুর মধ্যে প্রাণ বা অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করেছে। শক্তির সাধনা করতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে নানা লোকাচার-বিশ্বাস-সংস্কার এবং সহজ সরল মন্ত্র-বাক্য।

‘জন্মিলে মরিতে হবে।’ ‘লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।’ এরকম অনেক কথা প্রচলিত। প্রচলিত বিশ্বাসে কর্মফল গুণে আত্মা হয় বিষ্ণুদূতের হাত ধরে স্বর্গ-সুখ পায়, কিংবা যমদূতের হাত ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। ইসলাম ধর্মমতে আজরাইল ফেরেস্তার কথা বলা হয়েছে। শাস্ত্রীয় মতের জটিলতার বাইরে গিয়ে না-হিন্দু না-মুসলমান পটুয়া-চিত্রকরদের তৈরি যমপটের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। চার চোখো কুকুর, পেঁচা, পায়রা নিয়ে মোষের পিঠে বসে থাকা যমের ছবি নিয়ে ধর্মকথা বলা; পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে বেশ্যা হীরামণির কাহিনি। যমালয়ে শাস্তি-দৃশ্য দেখিয়ে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে সচেতন করা। বলাবাহুল্য শিকারে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির খোঁজে আদিবাসী সমাজের কোনও গোষ্ঠীর যাদব পাটকাররা আঁকতো মরা-হাজা পট। কিছু দিনের মধ্যে মারা গেছে, এমন কোনও বাড়িতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির নাম ধরে উচ্চস্বরে ডেকে, মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছে বলা হতো কিছু অলৌকিক কাজের জন্য মারাং বুরু ওই মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দিচ্ছেন বা অন্ধ করে রেখেছেন। ঝোলা থেকে বের করত চৌকো কিংবা ছোট্ট পটে আঁকা মানবমূর্তি। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে শুধু লিঙ্গমিল থাকতো। চোখের গোল তারাটি আঁকা থাকত না। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় কিংবা কাঁসার পাত্রে জল এবং তুলিতে রং নিয়ে চক্ষুতারা এঁকে দেওয়া হতো। সম্পূর্ণ হতো চক্ষুদান পর্ব।

আত্মা যাতে দুষ্ট শক্তিতে রূপান্তরিত হতে না পারে, সেজন্য আত্মার সদগতি ও মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে লোকসমাজ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি নিজস্ব একটা চিন্তার জগৎ তৈরি করেছে। শনি-মঙ্গল বারে মৃত্যু হলে মৃতদেহের সঙ্গে মোচা বা সোনা বেঁধে দিয়ে দোষ খণ্ডন করা হয়। আত্মাকে পথ দেখাবে এই বিশ্বাসে সাঁওতালরা চিতার সঙ্গে একটা মুরগি বেঁধে দেয়। এই একই বিশ্বাসে, রঙিন কাগজ ও বাঁশ নির্মিত দোলা রথ-নৌকো কলার ভেলায় ভাসানো হয়। গোলাকৃতির তপ্ত লোহার ছাপ মারা ষাঁড় উৎসর্গ করা হয়, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, যাতে শিবত্বপ্রাপ্ত হয় এই বিশ্বাসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন পোঁতা হয় বৃষকাষ্ঠ। নিকটস্থ তিন রাস্তার মোড়ে কিংবা পুকুরে এক বছরের জন্য স্থাপন করা হয়। পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা বেল বা নিম কাঠের চৌকো ধরনের নীচের অংশে থাকে খোদাই করা জপমালা হাতে প্রেত বা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে লিঙ্গ সাদৃশ্য রেখে নারী বা পুরুষের মুখ; তার উপর ষাঁড় বা ষাঁড়ের পিঠে শিব-দুর্গা; সবার উপরে ত্রিশূল বা শিবলিঙ্গের মন্দির। মুসলমানরা মৃতদেহের উপর বিছিয়ে দিতে তৈরি করে মরণ কাঁথা। এ নক্‌শি কাঁথায় গিঁট থাকে না। ‘ছুতর জামাল বধুয়া সুন্দরী’ পালায় বলা হয়েছে, ‘‘হিন্দু ভাই মইরা গেলে নিব গঙ্গার ভাটি।/ মুছলমান মইরা গেলে তারে পাইয়ে দিব মাটি।।’’

শ্রেয়কে উপেক্ষা করে প্রেয়র দিকে ছোটার অর্থ হলো মৃত্যুর দিকে ছোটা।

মনসা পুজোয় হাঁস বলি।

বশীকরণ।

পাঁঠা বলি।

আদি মানব-মানবী ছেলেপুলে নিয়ে বৈচিত্র্য তৈরি করেছে। কিন্তু তাহু গাছের ফলের সৌন্দর্য মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এটি একটি প্রচলিত গল্পকথা। লৌকিক দেবদেবীর সহায়তায় মৃত্যু এড়ানোর কাহিনিও অনেক আছে। এ প্রসঙ্গে সাপের ভয় থেকে মনসা, বাঘের ভয় থেকে দক্ষিণ রায় ও তার ক্ষুদ্র সংস্করণ বারা ঘট, রোগ জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে চণ্ডী— এরকম অসংখ্য আঞ্চলিক-লৌকিক দেবদেবীর নাম এসে যায়। এঁদের মূর্তি ভাবনাতেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের লক্ষণ স্পষ্ট। কোথাও পাথর বা মাটির ঢিবি এবং বাস্তবে যা দেওয়া সম্ভব নয়, ছলনার আশ্রয় করে দেওয়া উৎসর্গীকৃত শিল্পবস্ত্র বা ছলনের ভিড়। মৃত্যু এড়ানোর কামনায় আছে যমপুকুর ব্রত। আবার কোনও ব্রতে সতীনের মৃত্যু কামনা করে বলা হচ্ছে, 'সতীন কেটে আলতা পরি।' লোককথাগুলিতে দেখা যায়, বাস্তবে যা সম্ভব নয় কল্পনায় তার মৃত্যু ঘটিয়ে উচ্ছ্বাস বা আনন্দের প্রকাশ। জয় হয়েছে দুর্বল খরগোশ ও নাপিতের। বাঘ-সিংহ ও ব্রাহ্মণ তথা উচ্চ শ্রেণী পরাজিত। রূপ-যৌবনগত আদিম হিংস্রতায় মায়ের হাতে কন্যার মৃত্যু এবং রানিদের মধ্যে জটিলতা লক্ষণীয়। একটি পুরুষ মানে একটি গোষ্ঠী। ওই মানসিকতায় পুরুষ পুরুষকে হত্যা করেছে। বলি দিয়েছে। এ সমাজ ব্যবস্থা আজ আর নেই। শেষের দিকে বৈষ্ণবধারার আগমন শাক্ত ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে লৌকিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। ডোম-চণ্ডাল, শ্মশানবাসী কাপালিক, বৈষ্ণবী আচার এসব সমাজ ব্যবস্থার এক একটি দিক হয়ে গেল। পাশাপাশি পির-গাজিতে বিশ্বাস।

পাঁঠা, হাঁস, শুয়োর, মহিষ বলির পাশাপাশি চালকুমড়ো, আখ বলিও চালু আছে। কিন্তু বেশ কিছু গোষ্ঠীর কাছে জীবজগৎ, প্রকৃতি জগৎ এর কোনও একটির সঙ্গে আন্তরিক আবেগ জড়িয়ে থাকলে, তা হত্যা করার, বলি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব বিধিনিষেধ আছে। লৌকিক সমাজে এরকম নানা বিধিনিষেধ আছে। অসুস্থ কুকুর উঠোনে থাকলে ছদ্মবেশী যমদূতের উপস্থিতি কল্পনা করা হয়। চলার পথে কালো বেড়াল চলে গেলে কোনও অশুভ বাধা বা অকাল মৃত্যুযোগ। কাক, শকুন, পেঁচা, টিকটিকি কোনও না কোনও ভাবে লৌকিক সংস্কারে স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি আছে কুৎসিৎ নারী অর্থে ডাইনির নজর-সন্দেহ। লোকসমাজে প্রচলিত অভিযোগ বাণ মেরে ক্ষতি করা। মন্ত্রপুত বাণ। হলুদ-কাপড়ে অপমৃত্যুতে মৃত নারীর কেশ, মেটে সিঁদুর, ধুনো গুঁড়ো, শনের পোটলা এক সঙ্গে বেঁধে বন্ধন মন্ত্র উচ্চারণ করে; শত্রুর উদ্দেশে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। বন্ধন মন্ত্রটি হলো—

''আইসে ফিরিলাম মঙ্গল বারে।
বাণ বাঁধিলাম তার দুয়ারে।।
যেখানে বাঁন্দিলাম বাণ সেই খানে থাক।
যদি কেটে যাস ঈশ্বর ভগবানের মাথা খাস।।"

নানা মন্ত্র প্রচলিত। আবার আদিবাসী সমাজে মেয়েরা কোনও ব্যক্তির রেখাচিত্র এঁকে নির্দিষ্ট অঙ্গে ছুঁচ অর্থে বাণ ফুটিয়ে অমঙ্গল বা মৃত্যু কামনা করে।

খাওয়ার পর উত্তরে মাথা রেখে শুলে মৃত্যুর সম্ভাবনা। খড়িয়ারা মৃত ব্যক্তিকে উত্তরদিকে মাথা রেখে শুইয়ে রাখে। বিরহোড়দের বিশ্বাস কুলোয় বসলে মামা-মামী মারা যেতে পারে। হিন্দু সংস্কৃতিতে লাল রঙ শুভ, কিন্তু লাল রঙের সঙ্গে মৃত্যুর যোগ থাকায় কোথাও তা অশুভ। আর একটি বিদেশি উদাহরণ, একটি দেশলাই কাঠিতে তিনটি সিগারেট ধরালে মৃত্যু হতে পারে। আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটলে শত্রুপক্ষের বুঝে নেওয়া সম্ভব উল্টোদিকের যোদ্ধাদের সীমারেখা। হিন্দু লৌকিক সংস্কারে আছে শাঁখা ভেঙে গেলে বলতে হয় বেড়ে গেছে এবং সিঁদুর শেষ হলেও বলতে হয় সিঁদুর বাড়ন্ত। এ আসলে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা। খেতে বসে গান করা উচিত নয়। কারণ মৃত্যু। এ আসলে অভিজ্ঞতা নির্ভর বা বিজ্ঞান সম্মত সাবধানতা। যাইহোক লৌকিক মত, আয়ুহীন জনকে মাটি ফুঁড়েও সাপ ছোবল মারবে। উত্তরবঙ্গের 'বন্ধুয়ানা' গানেও মৃত্যু প্রসঙ্গ।

'মরিয়া যারে ঝ্যালেমা ভাতার
তোর বুকে চড়ুকরে মাটি।।'

কিন্তু মৃতদেহ পোড়ানোর রীতিতেই বিশ্বাসী।

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

উইলহেল্‌ম ভন হামবোল্ট : (১৭৬৭-১৮৩৬)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, লেখক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি পরে প্রাশিয়ার শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি ফ্রেডরিক হেগেলের সঙ্গে যৌথ ভাবে গীতার অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন আধুনিক ভাষাতত্ত্বের পথিকৃৎ।

উদ্ধৃতি : গীতার মতো এত সুন্দর দর্শনময় সঙ্গীত আর কোনও ভাষাতেই রচিত হয়নি। বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং গভীরতম প্রজ্ঞার পরাকাষ্ঠা হলো গীতা।

উৎস : দ্য আইডিয়া অব্ জাস্‌টিস—অমর্ত্য সেন।

অ্যানড্রু টমাস : (১৯০৬-২০০১)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ইউ. এফ. ও বিষয়ে একজন অস্ট্রেলিয় বিশেষজ্ঞ। তিনি পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক রচনা করেন। ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের উপর তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তকটি হলো, 'উই আর নট দ্য ফার্স্ট'।

উদ্ধৃতি : ভারতের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে যে সব মারণাস্ত্রের বর্ণনা আছে, তাতে আণবিক বোমার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। মহাভারতের 'মুষল' পর্বে বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের বর্ণনা আছে। যাতে বিপক্ষের সমস্ত সৈন্যবাহিনী এক নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং অবশিষ্ট জীবিতদের নখ এবং কেশের পতন হয়েছিল। বিনা কারণে মাটির পাত্রগুলি ভেঙে গিয়েছিল এবং পক্ষীকূল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খাবারদাবার বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। যখন কেউ প্রাচীন ভারতের সেই সাহিত্যগুলি পড়েন হিরোশিমার বীভৎসতার কথা মনে পড়ে যায়।

উৎস : উই আর নট দ্য ফার্স্ট-রিড্‌লস অব্ অ্যানসেন্ট সাইন্স— অ্যানড্রু টমাস।

আলেকজান্ডার ক্যাডাকিন : (১৯৪৯-....)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন রাশিয়ার বিখ্যাত বিদ্বান। তিনি বহু পুস্তক লিখেছিলেন। বহু বছর নেপাল এবং সুইডেনের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজও করেছেন। তিনি একজন সত্যিকারের ভারতপ্রেমী। বর্তমানে (১৯৯৮) তিনি ভারতের রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত আছেন।

উদ্ধৃতি : আমার মনে হয়, ঈশ্বর ভারতকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। এই দেশ সমস্তরকম সিদ্ধান্ত এবং সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতা রাখে। আমার হৃদয় সবসময় ভারতেই থাকে। আর ভারতের ভাবধারাগুলি আমার সঙ্গে যায়, তাতে উড়োজাহাজে অতিরিক্ত স্থানেরও প্রয়োজন হয় না। আর যখন আবার এই দেশে ফিরে আসি, নতুন ভাবনা লাভ করি।

উৎস : প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া--- দ্য কোএগজিস্‌টেন্স অব্ মাল্টিপ্‌ল রিয়ালিটিজ— দ্য টাইমস অব্ ইন্ডিয়া।

ড. আর্থার ভার্সেলুই : (১৯৫৯-....)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির আমেরিকার চিন্তাশৈলী ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি 'অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ্ এসোটেরিজমের' সভাপতিও হয়েছিলেন।

উদ্ধৃতি : বেদান্তের শিক্ষা আমাদের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কারণ পুরাকালের উপনিষদগুলিই আমাদের পবিত্রতম অধ্যাত্মবিদ্যা শেখাতে পারে।

উৎস : দ্য ইজিপসিয়ান মিস্ট্রি—আর্থার ভার্সেলুই।

বি.দ্র. : বিখ্যাত দার্শনিক যেমন ভল্তেয়ার, শোপেনহাওয়ার, হেগেল প্রমুখ এবং আধুনিক বিজ্ঞানী যেমন শ্রোইডিঙ্গার, নীল্‌স বোর, হেইসেন্ বার্গ, ওপেনহাইমার প্রমুখরা বেদান্তের অদ্বৈতবাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ড. লিন ইউটাং : (১৮৯৫-১৯৭৬)

পরিচিতি : ইনি হলেন বিখ্যাত চৈনিক লেখক, সাংবাদিক, গবেষক এবং অনুবাদক। তিনি ইংরাজি এবং চীনা ভাষায় বহু পুস্তকের রচনা করেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

উদ্ধৃতি : প্রাচীন ভারত ছিল চীনের ধর্মগুরু এবং কাল্পনিক সাহিত্যের শিক্ষক। আর সারা বিশ্বের ত্রিকোণমিতিক ও দ্বিঘাত সমীকরণ, ব্যাকরণ ও ধ্বনিবিজ্ঞানের শিক্ষাগুরু ছিল। ভারত কল্পনামূলক সাহিত্য রচনাতেও ছিল অগ্রগামী। দাবাখেলা ছাড়াও, আধুনিক আরব্য উপন্যাস, ঈশপের গল্প বা নীতিমূলক জীবজন্তুর উপকথাগুলি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকেই নেওয়া। ভারতের দর্শনশাস্ত্র প্রাচ্যের বহু মনীষীর যেমন গোয়েথ, হার্ডার, শোপেনহাওয়ার, এমার্সন এবং সম্ভবত ঈশপেরও অনুপ্রেরণার উৎস ছিল।

উৎস : দ্য উইস্‌ডোম অব্ চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া—লিন ইউটাং।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

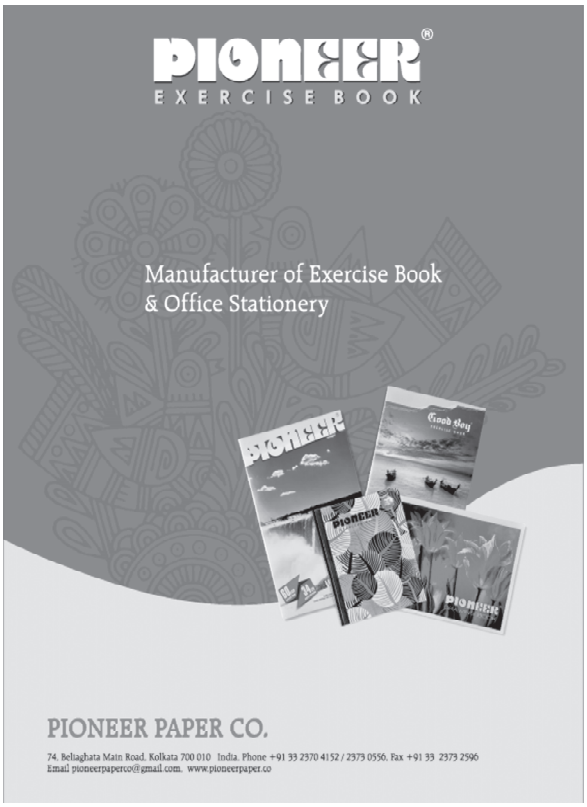

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

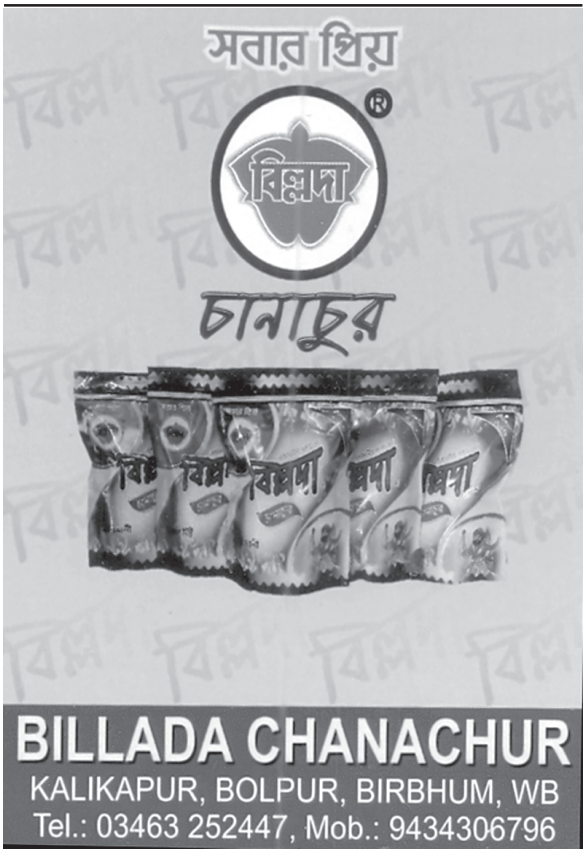

মিল অমিল

সিদ্ধার্থ সিংহ

ডায়েরি খুলে বাঁ দিকের পাতার একদম উপরে আর্যা লিখল—মিল। আর ডান দিকের পাতার উপরে লিখল—অমিল। তারপর ওর সঙ্গে সাত্যকির কী কী মিল, তা এক দুই তিন নম্বর দিয়ে দিয়ে লিখতে শুরু করল। মিল লেখাটার নীচে।

ও আইসক্রিম ভালবাসে। সেও। ওর নীল রং পছন্দ। তারও। ওর নিরিবিলি জায়গা ভাল লাগে, তারও তাই। এই ভাবে একের পর এক ওর সঙ্গে তার যা যা মিল মনে পড়ল ও লিখতে লাগল। তারপরে লিখল ওর কী কী তার ভাল লাগে। ওর হাসিটা খুব মিষ্টি। অনেক সময় ভাল না লাগলেও ও সব কিছু খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারে। যেখানেই দেখা করার কথা থাক না কেন, হাজার কাজ থাকলেও ও সবসময় আগে এসে দাঁড়ায়। বলে, তোমার ভালবাসার চেয়ে আমার ভালবাসার টান অনেক বেশি। তাই আমি সব সময় আগে আসি। সেকথা শুনে, আর্যা বহুবার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, তার ভালবাসার টানও কোনও অংশে কম নয়। কিন্তু যতবারই ও আগে গেছে, গিয়ে দেখেছে; তার বহু আগেই ও এসে হাজির। ওর আর একটা বড় গুণ, ওর মনে কোনও জিলিপির প্যাঁচ নেই।

আর কী! আর কী! আর কী! ওর সঙ্গে তার আর কী কী মিল আছে বা ওর আর কী কী তার ভাল লাগে, এই মুহূর্তে তার আর মনে পড়ছে না। ঠিক করল, পরে যদি মনে পড়ে, তখন লিখবে। তার চেয়ে বরং, তার সঙ্গে ওর কী কী অমিল বা তার কী কী ওর পছন্দ নয়, সেগুলো যে ক'টা এখন মনে পড়ছে, ও লিখে ফেলবে। তাই ডান দিকের পাতায় অমিল এর নীচে আর্যা লিখল— ও একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছে। বিয়ের পরেও ওর বাবা মায়ের সঙ্গেই ও থাকতে চায়। সেটা ওর একদম পছন্দ নয়। যাকে কোনওদিন দেখেনি, জানে না, চেনে না, সেই বাড়িতে বিয়ে করে যাচ্ছে বলে, আচমকা একজন ভদ্রমহিলাকে মা বলে ডাকতে হবে, এ কী কথা! ছিঃ! ওর হাতে আবার একগাদা আংটি। খুব ভাল কথা। হঠাৎ বিপদ আপদ হলে ওগুলো কাজে লাগতে পারে ঠিকই, কিন্তু তা বলে অত শিকড় পরতে হবে! এই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কেউ এ সব বিশ্বাস করে? খুব মনে আছে, সেদিন রাস্তার ধারে একটা বিড়ালছানাকে কুঁইকুঁই করতে দেখে, ও তাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। চায়ের দোকান থেকে ভাঁড়ে করে দুধ কিনে এনে খাইয়েছিল। তার পরে কোথায় ওকে ছাড়বে, তা নিয়ে ওর সে কী চিন্তা। আশেপাশে কোনও কুকুর নেই তো? হাঁটতে হাঁটতে আবার গাড়ি রাস্তায় চলে যাবে না তো। তারপরে সামনে বাজারে গিয়ে মাছের পট্টিতে ওকে ছেড়ে দিয়ে আসে।

কোনও মানে হয়। সপ্তাহে একদিন কী দুদিন দেখা হয়, তাও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। আর সেই সময়টা কেউ এভাবে নষ্ট করে! ওর এসব এক্কেবারে ভাল লাগে না। আর

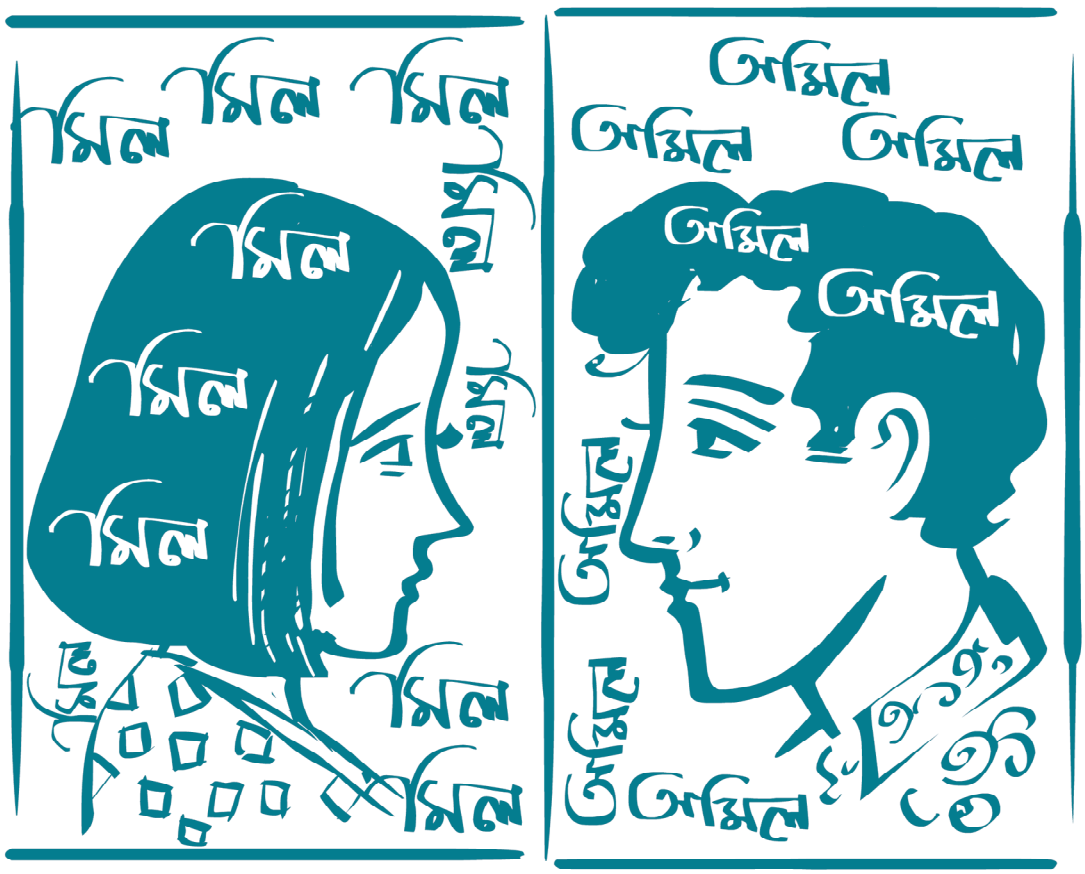

অপছন্দ? কেউ কখনও শুনেছে যে, বাবা মাকে ছেড়ে দূরে থাকতে হবে দেখে কেউ প্রমোশন নিতে চায় না? কোনও ছেলের সঙ্গে একটু হেসে হেসে কথা বলতে দেখলেই ওর মুখ গোমড়া হয়ে যায়। কী সব সাত-পাঁচ ভাবে। অথচ নির্জন জায়গায় কাছাকাছি হলেও হাত ছোঁয়া বা এক আধটা চুমুর বেশি ও এগোতেই সাহস পায় না। এত ভিতু! ওর আর কী কী পছন্দ নয় তার? তালিকাটা একটার পর একটা বাড়তেই লাগল।

মাস ছয়েকও হয়নি শিশির মঞ্চে একটা অনুষ্ঠানে অ্যাঙ্কারিং করতে গিয়ে সাত্যকির সঙ্গে পরিচয় হয় আর্যার। সাত্যকি দীর্ঘদিন ধরে আবৃত্তি করছে, এক বছরও হয়নি একটা টিভি চ্যানেলে কাজ করছে। বছর পঁচিশেক বয়স। দক্ষিণ কলকাতায় দু'পুরুষের বাস। দেখতে শুনতে মন্দ নয়।

আর্যা থাকে সল্টলেকে। তেরো নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে। ছোটবেলায় ছবি আঁকা শিখত। ফাইভে উঠে নাচে ভর্তি হয়। মাস ছয়েক গানেরও তালিম নিয়েছিল। কিন্তু কোনওটাতেই তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। শেষে কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে এক সহপাঠীর দেখাদেখি, সেও ভর্তি হয় অ্যাঙ্কারিংয়ের একটা কোর্সে। ছ'মাসের কোর্স। কোর্স শেষ হওয়ার পরে হাতে কলমে অভিজ্ঞতার জন্য ওই প্রতিষ্ঠানই আর পাঁচ জন ছাত্রছাত্রীর মতো তাকেও কয়েকটি জায়গায় সহ-অ্যাঙ্কারিং করার সুযোগ করে দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল শিশির মঞ্চের ওই অনুষ্ঠানটি। বয়স আঠারো কী উনিশ। হলদেটে ফরসা। গোলগাল। মুখশ্রীও বেশ ঢলঢলে। যে-কোনও ছেলের নজরে পড়ার মতো দেখতে।

শিশির মঞ্চের সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটে। সারা প্রেক্ষাগৃহ একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অনেকেই তাঁদের মোবাইল অন করে দেন। কিন্তু সেই আলো কোনও কাজে আসে না। হল ভর্তি লোক। কোন লোক কেমন, বলা মুশকিল। যে-কোনও সময় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা সামলে নেয় সাত্যকি। মঞ্চে উঠে খালি গলায় কথার জাদুতে দর্শকদের সে এমন মাতিয়ে রাখে যে, জেনারেটর চালু করে আলো জ্বালাতে জ্বালাতে হল-কর্তৃপক্ষের যে দশ বারো মিনিট সময় লেগেছিল, সেই সময়টা ও যে কী করে পার করে দিয়েছিল, কেউ বুঝতেই পারেনি। ও রকম পরিস্থিতির অমন সামাল দেওয়া দেখে আয়োজকেরা অবাক। অবাক হয়েছিল আর্যাও। কারণ, এমন সিচুয়েশনে পড়লে কী করতে হবে, সে কথা তার অ্যাঙ্কারিং সিলেবাসের মধ্যে কোথাও বলা ছিল না। এমনটা যে হয়, হতে পারে, এটা কেউ তাকে বলেওনি। সত্যিই এটা তার একটা বড় অভিজ্ঞতা। আর্যা ওর প্রশংসা না করে পারেনি। সেদিনই অনুষ্ঠানের শেষে ওদের মধ্যে ফোন নম্বর দেওয়া নেওয়া হয়েছিল।

সেই থেকে আলাপ। ফোনাফুনি এবং দেখা করা। এবং দ্রুত একজন অন্যজনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। আর এই জড়িয়ে পড়ার কথাটা আর্যা কারও কাছে লুকোয়ওনি। বন্ধুবান্ধবদেরও বলেছিল।

সব শুনে ওর এক বন্ধু বলেছিল, মেশ। কিন্তু দেখেশুনে মেশ। এখন আমাদের পড়াশোনা করার সময়। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। অন্য দিকে সময় নষ্ট করলে জানবি, আখেরে নিজেরই ক্ষতি। তার উপরে তুই যা বলছিস, তোদের দু'জনের মধ্যে কোনও মিল নেই, তুই চাস বিয়ের পরে আলাদা থাকতে। অথচ ও চায় বাবা মায়ের সঙ্গে থাকতে। তুই যেটাকে কুসংস্কার বলিস ও সেটাকেই সংস্কার মনে করে। তুই চাস হইহুল্লোড় করে জীবন কাটাতে, আর ও চায় শান্ত দিঘির মতো থাকতে। কী করে দুজনে একসঙ্গে থাকবি বল?

—তা হলে কী করব বল তো? জিজ্ঞেস করেছিল আর্যা।

বন্ধুটি বলেছিল, এক কাজ কর। দুটো কাগজ নে। একটা কাগজে লেখ, তোর সঙ্গে ওর কী কী মেলে, ওর কী কী তোর ভাল লাগে, সে সব। আর অন্য কাগজটায় লেখ, তোর সঙ্গে ওর কী কী অমিল। ওর কী কী তোর পছন্দ নয়, সে সব। তার পরে দ্যাখ, কোন দিকের পাল্লাটা ভারী। যদি দেখিস, মিলটাই বেশি, তখন এগোবি। আর যদি দেখিস, অমিল বেশি, তখন না হয় সরে আসবি।

—এত দিন মেশার পরে সরে আসব?

—কত দিন হয়েছে?

—প্রায় ছ'মাস।

—ছ'মাস? ধুস্, প্রেমের ক্ষেত্রে ছ'মাস আবার কোনও সময় নাকি?

—কিন্তু কী করে বলব?

—সবাই যে ভাবে বলে, সেই ভাবে বলবি, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আমাদের রিলেশনটা বোধহয় আর টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কিছু মনে কোরো না। আমরা বরং আজ থেকে খুব ভাল বন্ধু হয়ে থাকব, কেমন?

—যদি রাজি না হয়?

—তখন একটু কড়া হবি।

—তাতেও যদি না দমে?

—দেখা করবি না।

—ফোন করলে?

—ধরবি না।

—যদি কলেজের গেটে এসে দাঁড়ায়?

—ইগনোর করবি। ক'দিন দাঁড়াবে?

—যদি জোরাজুরি করে?

—ওর বাড়িতে ফোন করে বলবি, আপনাদের ছেলে আমাকে বিরক্ত করছে, ওকে সামলান।

—সেটা কি ঠিক হবে?

—সেটা পরের কথা। আগে দ্যাখ, কোনটা বেশি, মিল না অমিল।

ওই বন্ধুর কথা মতোই ও তালিকা তৈরি করতে বসেছে। ডায়েরির এক দিকের পাতায় পর পর লিখে যাচ্ছে মিল, আর অন্য দিকের পাতায় অমিল।

অমিল লিখতে লিখতে মিল পেয়ে গেলেই, পাছে ভুলে যায়, তাই চট করে মিলের পাতায় গিয়ে সেটা লিখে ফেলছে। মিল লিখতে লিখতে অমিল মনে পড়লেই, অমনি চলে যাচ্ছে অমিলের পাতায়। এই ভাবে লিখতে লিখতে আর্যা দেখল, ওর সঙ্গে সাত্যকির মিল এক পাতার মধ্যেই আটকে গেছে। অথচ অমিলগুলো একের পর এক বেড়েই যাচ্ছে। দ্বিতীয় পাতা ছেড়ে তৃতীয় পাতার শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছে। তার পরেও একটা একটা করে এখনও অমিল মনে পড়ছে।

তা হলে কী হবে। ও কি সাত্যকিকে না করে দেবে। না করে দিলে তো তারই ক্ষতি। ও যেটায় অনেকখানি সাবলীল হয়ে উঠেছে। ও যেটা সত্যি সত্যিই করতে চায়, সেটা হলো অ্যাঙ্কারিং। সাত্যকির সঙ্গে থাকলে ও আরও অনেক কিছু শিখতে পারবে। জানতে পারবে। বুঝতে পারবে। অনেক বেশি সুযোগ পাবে। এ লাইনে সাত্যকির বহু দিনের অভিজ্ঞতা। যতই বলি না কেন, আমরা আজ থেকে বন্ধু

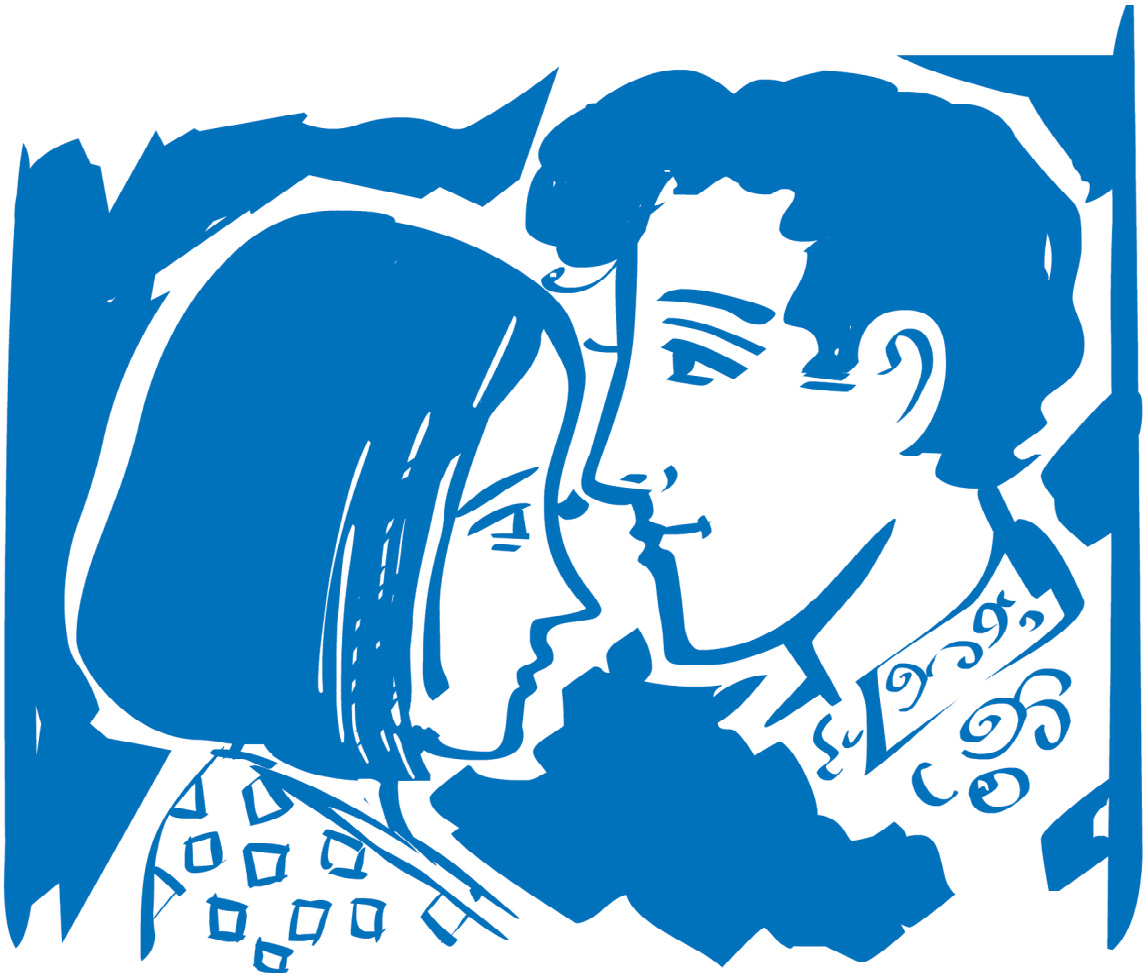

হয়ে থাকব, কিন্তু একবার প্রেম ভেঙে গেলে কি কেউ আর পাশে থাকে?

আচ্ছা, আমি যে ভাবে আমার সঙ্গে ওর কী কী মিল আর কী কী অমিল, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, ওর সঙ্গে আর এগোব কি না, আমার বাবা মা বা তাঁদের বাবা মায়েরা কি এ ভাবেই সিদ্ধান্ত নিতেন? আমি তো শুনেছি, আমার ঠাকুরমার নাকি বিয়ে হয়েছিল মাত্র সাত বছর বয়সে। পিঁড়িতে নয়, কাঁসার থালায় বসিয়ে যখন তাঁদের শুভদৃষ্টি করানো হচ্ছিল, তিনি নাকি তখন ঘুমে ঢলে ঢলে পড়ছিলেন। তাঁরা কি সুখী হননি? সব কিছু কি হিসেব করে হয়? আমার সঙ্গে তো ওর তবু কয়েকটা মিল আছে, যাদের কোনও মিল হয় না, তারা কী করে?

আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না! আমার সঙ্গে ওর যেখানে যেখানে অমিল, সেগুলোকে যদি মিলের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারি, তা হলে কেমন হয়? না হয় বিয়ের পরে ওর বাবা মায়ের সঙ্গেই থাকলাম। তাতে অসুবিধে কী? মা বাবারা কি ছেলে বউয়ের ক্ষতি চায়? না হয় ও ক'টা শিকড় বাকড় পরলই, কারও বিশ্বাসে আমি আঘাত করতে যাব কেন? না হয় ও একটু ভিতুই হলো। ভয় পাওয়া ভাল। খারাপ কাজ করতে যাবার আগে হাজার বার ভাববে। ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াবে। তার পরেও যদি ভয় পায়, যে কাছে থাকবে, তাকেই তো জড়িয়ে ধরবে, না কি? আর ওর কাছে কে থাকবে? সে তো আমিই। তা হলে সমস্যা কোথায়?

তারপর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। এতক্ষণ ধরে মিল-অমিলের তালিকা লেখা পাতাগুলো ডায়েরি থেকে ঝট করে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিল আর্যা। আর তখনই বেজে উঠল ওর মোবাইল ফোন। সাত্যকির।—কী করছ?

আর্যা বলল, কিচ্ছু না। তোমার কথাই ভাবছিলাম।—মনে আছে তো? চারটের সময় নন্দনের সামনে?

—অফিস নেই?

—আজকে তো নাইট।

—ওঃ হো...

—ঠিক সময়ে চলে এসো কিন্তু।

—হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ, তুমি আবার দেরি কোরো না যেন।

—কেন? কোনও দিন করেছি নাকি?

—না।

—তবে?

—ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। মোবাইল অফ করে আর্যা দেখল, ঘড়িতে একটা কুড়ি। রেডি হতে হতে আড়াইটে। তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ঘন ঘন বাস। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে বাস পেয়ে গেলে এক্সাইডের মোড়ে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে তিনটে। খুব বেশি হলে পৌনে চারটে। তার পরে মিনিট পাঁচেক হাঁটা। আজ ও আগেই যাবে। সাত্যকির আগে। সাত্যকিকে ও আজ একেবারে চমকে দেবে। প্রমাণ করে দেবে, এখন তার ভালবাসার টান ওর চেয়েও ঢের বেশি। তবে তার আগে আর একটা কাজ তাকে করতে হবে। এখন তো খুব তাড়া, তাই এখন নয়, বাসে উঠেই সেই কাজটা সারতে হবে। ওই বন্ধুটিকে ফোন করে বলতে হবে, তোর কথা মতোই মিল আর অমিলের হিসেব করতে গিয়ে দেখলাম, মিলের পাল্লাটাই বেশি। তাই এখন ওর কাছেই যাচ্ছি। ওর কাছেই। ■

খুকুর রান্নাঘর

ঘরের এক কোণে পড়ার টেবিলের নীচে খুকুর এক চিলতে রান্নাঘর। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রান্না করে খুকু। আদরের পোষা বিড়াল মিলি পাশে বসে চেয়ে চেয়ে দেখে। এমনিতে খুকুর ভালো নাম তমালিকা। স্কুলে সবাই ডাকে তমা। কিন্তু বাড়িতে সে নাম চলে না। বাড়িতে সে সবার খুকু। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে খুকুকে স্কুলে যেতে হয়। দাদুমণি তাকে স্কুলবাসে তুলে দিয়ে আসে। বাসে ওঠার সময় খুকু দাদুমণিকে বলে— তুমি এখন বাড়ি যাও, আমি স্কুল থেকে ফিরে তোমাকে রান্না করে দেব।

স্কুল থেকে ফিরে এসে খুকু দাদুকে বলে— এবার চলো আমার রান্নাঘরে, তোমায় আমি মাছের ঝোল আর ভাত খাওয়াবো। সকালের কথা হয়তো দাদু ভুলে গিয়েছিল। খুকুর ডাকে মনে পড়ে যায়। আনন্দে হাততালি দিয়ে দাদু বলে— চলো চলো, খুকুমনির রান্না ঘরে চলো। মিলি বিড়ালও কোথা থেকে এসে জুটে যায়।

মাদুর পেতে দাদু বসে থাকে। ছোট্ট ছোট্ট খেলনা বাসনে রান্না করে খুকু। একটু বাদে দাদুমণি বলে— খুকুমণি আজ কী মাছ রান্না হবে। খিলখিল করে হেসে খুকু বলে— আজ ট্যাংরা মাছের ঝোল, যা খেলে তোমার গায়ে শক্তি হবে।

রান্না হলো, দাদুমণিকে খেতে দেয় খুকু। পাশ থেকে ম্যাও ম্যাও করে মিলি বিড়াল। তার মানে তারও খাবার চাই। দাদু বলে— দাও না ওকেও একটা মাছ।

খুকু বোকা বোকা হেসে বলে— ও তো সত্যি মাছ ছাড়া খায় না! তারপর দুজনই হো হো করে হেসে ওঠে।

দাদুমণি আর মিলি ছাড়া খুকুর রান্নাঘরে আর কেউ আসে না। মাকে অনেকবার বলেছে সে, মা বলে— যেদিন

সত্যিকারের রান্নাঘরে রান্না করবি সেদিন তোর হাতের রান্না খাবো। মুখ ভার করে খুকু বলে— আমি তো সত্যি সত্যি রান্না করি, দাদুমণি মিলি তো খায়। একদিন তুমি এসো, দেখবে তোমাকেও খেতে দেব।

কিন্তু মা আসে না। আর বাবা তো বাড়িতেই থাকে না। রাতে যখন বাবা ফেরে তখন খুকু ঘুমিয়ে পড়ে। তাই বাবাকেও কোনওদিন রান্না করে খাওয়ায়নি খুকু।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে খুকু ছুটলো দাদুমণির ঘরের দিকে। আজও সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় দাদুমণিকে সে কথা দিয়েছে, ফিরে এসে রান্না করে খাওয়াবে। দাদুমণি তো সেদিন যায়নি, তাই আজ সে দাদুকে বিরিয়ানি রেঁধে খাওয়াবে।

খুকু দাদুর ঘরের সামনে গিয়ে দেখে দাদুর ঘরের দরজা ভেজানো। দাদু তো কোনওদিন দরজা বন্ধ করে রাখে না। তাহলে কি দাদুর শরীর খারাপ? দরজাটা খুলে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকলো খুকু। কিন্তু দাদুমণিকে দেখতে পেল না। এমনকী ঘরে দাদুর কোনও জিনিসপত্রও নেই। আলনাতে কোনও জামাকাপড় নেই, দেওয়ালে হুকে আটকানো ছাতাটিও নেই।

খুকুর মন খারাপ হয়ে গেল। দাদু তাকে না বলে কোথায় চলে গেল? খুকু দৌড়ে এলো মায়ের কাছে, জিজ্ঞেস করলো— মা দাদুমণি কোথায়?

মা বলল— দাদুমণি একটা ভালো জায়গায় গেছে। যেখানে আরোও অনেক দাদুমণি থাকে।

খুকু বলে—কেন?

খুকুর গাল টিপে মা বলল— দাদুর কত বয়স হয়েছে, একা একা থাকে। তাই এখন থেকে দাদু তার বন্ধুদের সঙ্গে থাকবে। খুকুর খুব কান্না পেল, কেঁদে কেঁদে বলল— দাদুমণি আর আসবে না? আমি যে দাদুমণিকে বিরিয়ানি খাওয়াবো বলেছিলাম।

মা বলল— ঠিক আছে, আমরা যেদিন দাদুমণিকে দেখতে যাবো সেদিন বিরিয়ানি নিয়ে যাবো।

অনেকদিন পর এলো সেই দিন। মা বলল, আমরা আজ দাদুমণির কাছে যাচ্ছি। শুনে খুকুর খুব আনন্দ হলো। মা সকাল থেকে ব্যস্ত। রান্নাঘরে সত্যি সত্যি বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে। খুকুমণির নিজের রান্নাঘর অনেকদিন বন্ধ, আজ সেও টেবিলের নীচ থেকে তার রান্নার সরঞ্জাম বার করলো। চুপি চুপি সেগুলি ঢুকিয়ে নিল ব্যাগে।

গাড়ি করে যখন তারা দাদুর থাকার নতুন জায়গায় এলো, দাদু তখন বারান্দায় বসে। মা হাতের টিফিন বক্সটা এগিয়ে দিল। দাদু সেটা পাশে রাখলো। খুকুর দিকে তাকিয়ে বলল— খুকুমণি তুমি আমার জন্য কী এনেছো? খুকু তখন ব্যাগ থেকে বার করলো তার রান্নার সরঞ্জাম। দাদু হাততালি দিয়ে বলল—আজ তাহলে কী রান্না হবে?

খুকু বলল—বিরিয়ানি।

(প্রচলিত)

ভারতের পথে পথে

রায়গড় দুর্গ

মহারাষ্ট্রে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি দক্ষিণ ভারতে হিন্দু স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সময়টা ১৬৭৮ সাল। তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রায়গড়। এই রায়গড় দুর্গেই শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। ভারতের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ করে মোঘলদের কাছ থেকে শিবাজী বহু দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই রায়গড় দুর্গ। নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করার পর রায়গড় দুর্গকে তিনি সংস্কার করেন। শিবাজী ও মারাঠা সাম্রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় আজও দাঁড়িয়ে আছে রায়গড় দুর্গ।

জানো কি?

- বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু।
- সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠা করেন মেঘনাদ সাহা।
- ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সূচনা হয় এশিয়াটি সোসাইটির হাত ধরে।
- এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়াম জোনস।
- ভারতের প্রথম মহিলা কলেজের নাম বেথুন কলেজ।

ভালো কথা

বসুন্ধরা দিবস

এই পৃথিবীকে ভালো রাখার অঙ্গীকারের দিন বসুন্ধরা দিবস। পৃথিবী আমাদের জল, বায়ু, আলো দিয়ে প্রতিপালিত করছে, তাকে সুরক্ষিত রাখাও আমাদের কর্তব্য। আমরা প্রতিদিন নানাভাবে জ্ঞানে- অজ্ঞানে পৃথিবীকে দূষিত করে থাকি। এইভাবে চলতে থাকলে আমাদের সুন্দর এই পৃথিবী একদিন সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গাছ বাঁচানোর কথা প্রচার করেছে। যাতে অকারণে কেউ গাছের উপর পীড়ন না করে। এরকম ঘটনা সত্যিই হয়ে থাকে, অনেকে অকারণে গাছের ডাল ভেঙে নেয়, লতাপাতার উপর আঘাত করে। আমরা তখন ভুলে যাই অকৃজ্ঞতার কথা। একটি গাছ মানবজীবনকে কত ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে তার কোনও হিসেব নেই। তাই পৃথিবীকে সুন্দর রাখতে হলে গাছকে স্নেহ করতে হবে, তার যত্ন নিতে হবে।

অয়ন্তিকা পাল, অষ্টম শ্রেণী, রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

উত্তর কলকাতা

সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়, সপ্তম শ্রেণী, শোভাবাজার

টুং টুং করে রিক্সা চলে
উত্তর কলকাতার পথে পথে
ঢং ঢং করে ট্রাম গাড়ি
যাত্রী নিয়ে ধীর চলে,
বিকেলবেলা গঙ্গার ঘাট
সূর্য চলে পাটে
মুক্তবায়ু মুক্তাকাশে
ক্লান্তি যায় কেটে

বিশাল বিশাল দালান বাড়ি
বনেদিয়ানার ছাপ
রাজার হালে রাজার বেশে
করছে যেন রাজ,
পুজোর সময় সেরা পুজো
উত্তর কলকাতায়
প্রথম শহর আদি শহর
এখানেই আছে সব।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

জন্মশতবর্ষে এক সিনেমাওয়ালা

অরোরার অজিত বসু

কণিকা দত্ত

বাগবাজারের বাসিন্দা অনাদিকুমার বসু, তাঁর বন্ধু দেবীপ্রসাদ ঘোষ ও ভাগ্নে সতীভূষণ ঘোষকে নিয়ে তৈরি করলেন ম্যাজিক থিয়েট্রিকাল কোম্পানি, তখন ১৯১৪ সাল।

কিন্তু কেন? অনাদিকুমারের ভাই ব্রজেন্দ্রনাথ বসুর নেশা ছিল প্রোজেক্টর মেশিন নিয়ে বাইরে বাইরে শো করা। কিন্তু একবার আর্থিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় ব্রজেন্দ্রনাথবাবু তাঁর সাধের প্রোজেক্টর মেশিনটি জনৈক প্রমথনাথ গাঙ্গুলির কাছে জমা রাখেন। খবর পেয়ে অনাদিকুমার সেই মেশিনটি কিনে নেন। উদ্দেশ্য, টিকিটের বিনিময়ে সিনেমা দেখানো। সেই সঙ্গে উইলিয়ামসন ক্যামেরাও কিনে ফেলেন ছবি তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে। ওই ক্যামেরাটিই ছিল ভারতে আমদানি হওয়া প্রথম বিদেশি ক্যামেরা।

তিন অংশীদার বিপুল উৎসাহ ও উদ্যোমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিনোদন ব্যবসায়। দমদমের ঘুঘুডাঙায় সুরেন্দ্রনাথ রায়ের বাগানবাড়িতে বিভিন্ন রকম ছবি তোলা হতো, আর তা দর্শনীর বিনিময়ে প্রদর্শিত হতো। ক্যামেরা চালাতেন দেবীপ্রসাদ ঘোষ।

শুরুতেই বিপুল সাড়া ফেলে দিল 'ম্যাজিক থিয়েট্রিকাল কোম্পানি।' যেহেতু ছবি প্রযোজনা ও পরিবেশনাকে পাখির চোখ করে ছিলেন অনাদিনাথ। তাই কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে রাখলেন 'অরোরা সিনেমা কোম্পানি'। এতদিন সংস্থাটির স্থায়ী ঠিকানা ছিল অনাদিনাথদের বাসভবন ৪১, কাশী মিত্র স্ট্রিট। সেটি ১৯২১ সালে স্থান পরিবর্তন করে উঠে এলো রাজবল্লভ স্ট্রিটে। তার তিন বছর পরে 'অরোরা সিনেমা কোম্পানি' তৎকালীন ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে এলো 'অরোরা ফিল্ম করপোরেশন' নাম নিয়ে। কোম্পানির রসায়ণাগার অবশ্য রয়ে গেল কাশী মিত্র স্ট্রিটের বাড়িতেই। সেই সঙ্গে ১৯৩৬ সালে নারকেলডাঙায় তৈরি করলেন অরোরা স্টুডিও। সূচনা হলো বাংলা ও হিন্দি ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনার নতুন অধ্যায়ের। এহেন প্রেক্ষাপটে ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ণের স্নাতক, উত্তরকালে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পুরোধা পুরুষ অনাদিনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অজিত বসুর 'অরোরা ফিল্ম করপোরেশনে' প্রবেশ।

জন্ম ১৯১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর। মা প্রফুল্লনলিনী বসু ছিলেন হাওড়া বামনপাড়ার বাসিন্দা রাধিকামোহন দে-র কন্যা। ছয় ভাইবোনের মধ্যে অজিত বসুই ছিলেন বড়। অজিত বসুদের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার মাহীনগর।

প্রাথমিকভাবে বাবা'র ব্যবসায় অতটা আগ্রহী ছিলেন না অজিত বসু। কিছুটা নিজের জেদে পিতার অমতেই ল'পড়তে শুরু করেন যুবক অজিত। তাতে অবশ্য কোনও আপত্তি করেননি অনাদিনাথ। ইতিমধ্যেই পারিবারিক চাপে বিবাহ করতে হয়েছে হাটখোলার দত্তবাড়ির আশুতোষ দত্তর কন্যা ইলাকে। সেটা ১৯৪৫ সাল।

কিন্তু পরের বছর অনাদিনাথের আচমকা মৃত্যু সবকিছু ওলোট পালোট করে দিল অজিত বসুর। ল' পড়া বন্ধ রেখে বড় ছেলে হিসেবে বাবার ব্যবসা ও পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন অজিত। সঙ্গে পেলেন ছোট ভাই অরুণকুমারকেও। নিউথিয়েটার্স-এর বি এন সরকারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন অনাদিনাথ। বি এন সরকারের ইচ্ছে ছিল নিউ থিয়েটার্সের ছবির পরিবেশক হোক অরোরা। দূরদর্শী অজিত বসু সেই প্রস্তাব লুফে নিলেন। নিউ থিয়েটার্সের দুরবস্থায় সেখানকার স্টুডিও ম্যানেজারেরও

দায়িত্ব পালন করলেন তিনি।

এরপর এলো বাংলা সিনেমার সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়। এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে অজিতবাবু মোড় ঘুরিয়ে দিলেন বাংলা সিনেমার। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' পরিবেশনার দায়িত্ব নিলেন তিনি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে মেট্রো সিনেমা হলে ছবিটি দেখতে দেখতে অজিত বসু'র মনে হলো 'A director is born !' ছবি দেখার পরেই প্রযোজক রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি সমাধা করে ফেলেন অজিতবাবু। 'পথের পাঁচালি' মুক্তি পেল বীনা, বসুশ্রী, শ্রী-তে। ১৯৫২ সালে। বাকিটা তো ইতিহাস। ছবির মুক্তির আগে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় পুরো পাতা জুড়ে 'পথের পাঁচালি'র বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সিনেমা বিজ্ঞাপনে সেটাও ছিল বিপ্লব। বিজ্ঞাপনটি তৈরি করেছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায় স্বয়ং।

'পথের পাঁচালি' কিন্তু সেভাবে বাণিজ্যসফল ছবি ছিল না। কিন্তু প্রশংসিত হতে থাকল দেশে-বিদেশে সর্বত্র। আসতে লাগল একটির পর একটি পুরস্কার। 'সামাজিক ভাবে' সেই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অজিতবাবুরা সত্যজিৎ রায়ের আরও দুটি ছবি প্রযোজনা করলেন 'অপরাজিত' ও 'জলসাঘর'। পরিবেশনার দায়িত্ব নিলেন 'পরশ পাথর' ছবিটিরও।

নব তরঙ্গের অন্যতম বরেণ্য পরিচালক ঋত্বিক ঘটক অরোরা স্টুডিওতে চাকরি করতেন তথ্যচিত্রের পরিচালক হিসেবে। পরবর্তীকালে ঋত্বিকের 'অযান্ত্রিক' পরিবেশন করে অরোরা ফিল্ম করপোরেশন। আর এক কিংবদন্তি পরিচালক মৃণাল সেন কিছুদিন অরোরা স্টুডিওতে কাজ করেছিলেন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়র হিসেবে। যদিও তাঁর কোনও ছবি প্রযোজনা বা পরিবেশনা করার সুযোগ ঘটেনি অজিতবাবুর। বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের কালজয়ী জুটি উত্তম-সুচিত্রা'রও দুটি ছবি 'ওরা থাকে ওধারে' ও 'সদানন্দের মেলা' প্রযোজনা করেন অজিতবাবু।

মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি 'নিউ ওয়েভ' সিনেমার পৃষ্ঠপোষকতা সমানভাবে করতেন অজিতবাবু। কারণ তিনি মনে করতেন সব সিনেমা যে 'হিট' হবে তার কোনও মানে নেই। সাফল্য, ব্যর্থতা নিয়েই সিনেমার ব্যবসা। তাই ব্যবসায়ী হয়েও সামাজিক দায়িত্বের কথা কখনওই বিস্মৃত হননি অজিতবাবু। তাঁর মতে, 'এইসব চরিত্রদের দেখেই তো একটা প্রজন্ম প্রেরণা পাবে।' তাই অজিতবাবুর আমলে 'প্রহ্লাদ' (১৯৫২), 'জয়দেব' (১৯৫৪), 'ওরা থাকে ওধারে'র (১৯৫৪) মতো ছবির পাশাপাশি 'চুপি চুপি আসে' (১৯৬০), 'স্বপ্ন নিয়ে' (১৯৬৬),'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৬৫)-এর মতো ছবিও প্রযোজনা করেছে অরোরা ফিল্ম করপোরেশন। পরিবেশনার ঝুঁকি নিয়েছেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'ময়নাতদন্ত'র মতো ছবির। কোনওকালেই বন্ধ করেননি তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজ। যা ছিল বসু পরিবারের ব্যবসার ইউ এস পি।

সত্যজিৎ রায় তৈরি করেছিলেন সেলুলয়েডের 'পথের পাঁচালি' যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ। আর বাংলা ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে অন্য এক 'পথের পাঁচালি' তৈরি করেছিলেন অজিত বসু। যা কোনও সময়সীমার ঘেরাটোপে বাঁধা পড়ে নেই। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি প্রযোজনা ও পরিবেশনা সংস্থা কাজ করে চলেছে। সমান ঐতিহ্যে, আভিজাত্যে ও আদর্শের পথ ধরে।

জীবদ্দশাতেই পুত্র অঞ্জন বসুকে যথাযোগ্য দীক্ষিত করে গিয়েছিলেন অজিত বসু। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই অরোরাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিভূ অঞ্জনবাবু, সুব্রত বসু, অমিয়কুমার বসুরা।

১৯৯৪ সালে ১৭ জুন প্রয়াত হন অজিত বসু। তাঁর জন্মশতবর্ষে আত্মবিস্মৃত বাঙালি মনে রাখুক সেই সিনেমাওয়ালাকে, যিনি সিনেমা ব্যবসাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন একটি জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করার জন্য। ■

বইপাড়ার খবর

স্মৃতিমেদুর বিষণ্ণ ‘জলতরঙ্গ’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পেশার তাগিদে, নেশার টানে বুদ্ধদেব গুহ চযে বেড়িয়েছেন জঙ্গল থেকে জনপদ। সেই অন্তহীন পরিক্রমায় পাঠ নিয়েছেন বিচিত্র জীবনের নানা অধ্যায়ের, বহুবর্ণ অভিজ্ঞতায় ভরে উঠেছে তাঁর স্মৃতির ঝাঁপি। আজ, জীবনের সায়াহ্ন বেলায় সেই ছড়ানো টুকরো নুড়ি-পাথরে শুনতে পান জলতরঙ্গের রিনরিনে শব্দ। শোনান আমাদেরও। দেজ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা একটি কথা সংকলন। যেটি লেখকের ভাষায়, ‘শিলাদিত্য’-র ধারাবাহিকের নাম ভুল ক্রমেই বলতে হবে দিয়ে ফেলেছিলাম ‘এলোমেলো’। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, এই নামটিকে বদলানো দরকার। বদলে এই সংখ্যা থেকে লেখাটির নাম করণ করলাম ‘জলতরঙ্গ’, যে বাজনার সঙ্গে আমরা ছেলেবেলা থেকে পরিচিত ছিলাম এখন আর এর বিশেষ চল দেখি না।’

আসলে ‘জলতরঙ্গ’ লেখা হয়েছিল ‘শিলাদিত্য’ মাসিক পত্রিকাতে। সেগুলিকে দুই মলাটে বন্দি করেছে দেজ।

কিন্তু বাঁধতে চাইলেই কি আর আগল পরিয়ে রাখা যায়? চোখ গিয়েছে, তাই বিশেষ লিখতে পারেন না বুদ্ধদেব। কিন্তু মন, সে ঘুরে বেড়ায় স্মৃতির সরণি ধরে সেই ম্যাকলাস্কিগঞ্জে ফেলে আসা সাধের বনবাংলো ‘দ্য টপিং হাউস’-এর আনাচে কানাচে। রাঁচি-পালমৌ-এর পর্ণ-পথে, ওড়িশা কিংবা নামনি অসমের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে।

এরকম কোনও এক ‘হেমন্তের শেষ বিকেলে ছিপ হাতে সেই অরণ্যবেষ্টিত বিরহী নদীতে মাছ ধরতাম আমি। এই বিরহী নদীর কাছেই যেখানে বাইজি জওহর বাই মির্জাপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সন্ধের মুখে ঝুমঝুমি বাজানো ঘোড়ায় টানা টাঙাতে চড়ে।

‘জওহর আমাকে ডেকে নিয়ে হাতে হাত রেখে বলেছিল যে, আমি চলে যাচ্ছি।’ সখেদে বলেছিলাম, ‘তুমি আমায় কিছু দিয়ে গেলে না?’ জওহর বাই বলেছিল উত্তরে, তোমাকে যা দিয়ে গেলাম, তা আর কাউকে এ জীবনে দিতে পারব না।

‘আমি শুধিয়েছিলাম, তা কী জওহর?’

আমার হাতে হাত রেখে জওহর বলেছিল— ‘পহেলি প্যায়ার’। (পুজোর ভ্রমণে পহেলি প্যায়ার, পৃষ্ঠা ৩৭)।

এই ভালোবাসার মায়ামৃগই সারা জীবন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বুদ্ধদেবকে। সে কথাই তিনি লিখছেন। অভিমান ভরে ‘কল্যাণীয়াসু কুমু’কে। লিখছেন, ‘আমার জীবনে চিরদিন এই হয়েছে। যাকে বা যাদের আমি ভালোবেসেছি, তাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই আমাকে ভালোবাসা তো দূরস্থান, পছন্দও করেননি। এই অমোঘ সত্যকে গভীর দুঃখের সঙ্গে মেনে নিয়ে সেই দুঃখকে সুখ এবং সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে লেখায় গানে ছবিতে উৎসারিত করে নিজের অস্থির চিত্তকে সমাহিত করার চেষ্টা করেছি।’ (শান্তিনিকেতনের চিঠি, পৃষ্ঠা-১২৪)

তাই বইটি পড়লে লেখক, গায়ক, শিকারি, ভোজনরসিক, পান-প্রিয়, রসিক, প্রেমিক, বিরহী, পর্যটক ও পর্যবেক্ষক বুদ্ধদেব গুহকে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারা যাবে।

তবুও বড় বিষণ্ণতায় ভরা এ ‘জলতরঙ্গ’। একাধিক লেখায় দিন ফুরনোর হারাকার। লেখেন, ‘বিভূতিভূষণ চলে গিয়েছেন, আমিও যাওয়ার পথে। কিন্তু আমরা থাকি আর নাই থাকি। এই পূর্ণ চাঁদের মায়া আর এই চন্দ্রালোকিত বনপাহাড়ের নিথর অরণ্যানি, বনফুলের মিশ্র গন্ধ, ঘাইহরিণীর তীক্ষ্ণ স্বর— সবই থেকে যাবে, যতদিন এই পৃথিবী থাকবে।... বসন্ত আসবে প্রতিবছর। পূর্ণিমা আসবে প্রতিমাসে। শুধু আমিই থাকব না।’ (বসন্ত আসবে, শুধু আমিই থাকব না, পৃষ্ঠা-৭০)।

সত্যিই তো বিভূতিভূষণের পর আর কেই বা আমাদের চিনিয়েছেন জঙ্গলের জঙ্গমতা, শুকিয়েছেন গাছের ছালের শুকনো সোঁদা গন্ধ!

জলতরঙ্গ— লেখক : বুদ্ধদেব গুহ।
প্রকাশক : দেজ পাবলিশিং।
মূল্য : ২৫০ টাকা।

বাংলা কবিতায় বুদ্ধচর্চা
উৎস থেকে সাম্প্রতিক

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী

বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৬২৪-৫৪৪ খ্রি.পূ.)। তিনি কোনও দৈববাণী শুনে হঠাৎ একটা নতুন মতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হননি। সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি যা দেখেছেন তারই ওপর ভিত্তি করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং তা জনসমক্ষে প্রচার করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল মূলত প্রচলিত ধ্যানধারণা ও জ্ঞান-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আজকের দিনে এস্টাব্লিশমেন্ট বলতে যা বোঝায়, তার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় এককভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সব মানুষ সমান। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কোনও উঁচু-নীচু ভেদ নেই; বুদ্ধের মুখে এ ধরনের অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সাধারণ মানুষ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মানবপ্রেমের কথা মানুষ আগেও শুনেছে, কিন্তু সমগ্র প্রাণীজগতের প্রতি এই উদার মনোভাব ইতিপূর্বে এত বলিষ্ঠ কণ্ঠে আর কখনও কেউ বলেননি। বুদ্ধই প্রথম মানুষ যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলে কোনও অদৃশ্য শক্তিকে মেনে না নেওয়ার সাহসিকতা দেখিয়েছেন। তিনিই প্রথম দেখালেন— অস্তি নেই, নাস্তি নেই নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে। অর্থাৎ ক্রিয়া আছে কর্তা নেই। আত্মাকেও তিনি মানেননি। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রয়ে গেছে চিরস্থায়ী বৌদ্ধপ্রভাব। বৌদ্ধচিন্তন ও ধর্মাদর্শ ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়ে গড়ে তুলেছে বিশ্ববৌদ্ধধর্ম।

বৌদ্ধধর্ম শেষ আশ্রয় পেয়েছে বঙ্গদেশে। এখানে অপেক্ষাকৃত বেশি দিন থেকে পাড়ি দিয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলিতে। তাই বঙ্গভূমির আর এক নাম বুদ্ধভূমি। কেননা এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ বুদ্ধের ভাবধারায় উজ্জীবিত। বৌদ্ধধর্ম আড়াই হাজার বছরের বিবর্তনে এগিয়েছে। আর বঙ্গের সাহিত্য-ইতিহাস প্রায় এক হাজার বছরের। যার পরিচিতি বহন করছে চর্যাপদ। চর্যাপদের মাধ্যমে বঙ্গদেশ সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। বাঙালির কাব্যে বুদ্ধচর্চার প্রথম পরিচয় তাঁর আত্মপ্রকাশকালে। চর্যাপদকেই বাংলা কাব্য জগতের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়।

বুদ্ধের স্মৃতিস্পর্শে চর্যাপদ ধন্য। সেই চর্যাপদ থেকেই যাত্রিকের যাত্রা শুরু। ধর্মের তত্ত্বকে সহজভাবে গ্রহণ করে বৌদ্ধ আচার্যগণ বাংলা কাব্যধারার প্রথম জাতকর্ম সম্পাদন করেন। সহজ সরল ভাষা ও ভঙ্গিতে পদ রচনা করেন। চর্যাপদের কবিরা বৌদ্ধবিহার নিবাসী ভিক্ষুদের উত্তর সাধক। অভিনব কোনও দর্শন তাঁরা সৃষ্টি করেননি। তবে সুদূর অতীত থেকে দুঃখ তাড়িত মুমূর্ষু মানুষের মুক্তির পথ

নির্দেশ করেছেন। চর্যাপদের কবিরা বলেন, দেহের মধ্যে 'বুদ্ধ' বাস করেন আর এখানে তাঁকে সন্ধান করতে হবে, জপে-তপে, ধ্যান-ধারণায় নয়—

পণ্ডিঅ সঅল সথ বরখানই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ন জানই।।

(বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১৩২৩ পৃ. ১০৭)

বাংলায় চর্যাপদের ঐতিহ্য আদিযুগ থেকে মধ্যযুগের নাথসাহিত্য পর্যন্ত চলেছে অনন্ত প্রবাহে। নাথধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের যোগসূত্র খুবই ঘনিষ্ঠ। এরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমকে অগ্রাহ্য করেছে। নাথসাহিত্যের 'আদিনাথ', শূন্যপুরাণের 'প্রভু নিরঞ্জন' এবং ধর্মমঙ্গলের 'ধর্মঠাকুর'— এরা প্রায় এক ও অভিন্ন। বাংলাসাহিত্যে এঁরা বুদ্ধের ঐতিহ্য বহন করে এনেছেন। এঁরা তার উত্তরসাধক নন, কিন্তু প্রতিবিম্ব। মঙ্গলকাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

চর্যাপদে যে সাধনার শুরু, তাই পরিণতি লাভ করে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, তথা বাউলের একতারার সুরঝঙ্কারে। বাউলের উদ্ভব হয় ১৬২৫-৭৫ সালে। *(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য /*

বাংলার বাউল ও বাউল গান / পৃ. ২০৯) এঁরা বৌদ্ধাচার্যদের মনন ও সাধনধারা বজায় রেখেছেন। শাক্ত পদাবলীকেও বলা যায় চর্যাপদের ক্রমিক পরিণাম।

বুদ্ধ একদা নিজেকে কৃষক বলে অভিহিত করেছিলেন। কাশী ভরদ্বাজ নামে এক ব্রাহ্মণকে তিনি বলেছিলেন : 'আমি কর্ষণ ও বপন করে খাদ্য সংগ্রহ করি। সত্য আমার নিড়ানী, শ্রদ্ধা আমার বীজ, তপ আমার বৃষ্টি, প্রজ্ঞা আমার যুগ ও লাঙল, বিনয় আমার ঈষ।' *(সুত্তনিপাত/পি.টি.এস./পৃ. ১২-১৫)*। অষ্টাদশ শতকের কবি রামপ্রসাদ লিখেছেন :

'বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে,
ক্ষার হবে তার পরিপাটি
কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই,
মনের ময়লা যাবে কাটি'।

বুদ্ধের দর্শনমতে সমস্তই অনিত্য, সমস্তই অনাত্ম। এই কথা বিস্মৃত হওয়ার নয়। বস্তুত এ বৌদ্ধ দর্শনেরই প্রতিধ্বনি। বুদ্ধের দৃষ্টিতে কৃষি অমৃত ফলদায়ী। আর রামপ্রসাদের কাব্যে তাই পরিণত হচ্ছে সোনার ফসলে;

'মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।'
(অমরেন্দ্রনাথ রায়/শাক্ত পদাবলী/পৃ. ১৬৮)

আধুনিককালে নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) 'অমিতাভ' বাংলা ভাষায় বুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জীবনীকাব্য। এতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

'ফুরাইল শেষ কথা, ধীরে বুদ্ধদেব
হইলা নীরব, ধীরে, মুদিলা নয়ন।
ভিক্ষুগণ এককণ্ঠে ভক্তি উচ্ছ্বসিত
গাইল, সে মহাবন করিয়া ধ্বনিত—
বুদ্ধং মে শরণং
ধর্মং মে শরণম্।
সংঘং মে শরণম্।

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯৪২) 'বৈশাখ' কবিতায় :

ভারতেরে করিলে তুমি প্রবুদ্ধ
বুদ্ধেরে দিলে আনি
এশিয়ার আলো চুমিল প্রথম
তোমার ললাট খানি।

বুদ্ধের মহান ঐতিহ্য গভীর প্রেরণা ও কাব্যব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৫৫) ভক্তিপ্লুত চিত্তে। তাঁর রচিত অনেকগুলি কবিতাতে বুদ্ধ ভাবনা উজ্জ্বল। সন্তানহারা মা কিসা গৌতমীর উপলব্ধি। :

নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে
শিখাইলে শেষ শিক্ষা
জিয়াতে চাহি না তনয়ে আমার
ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার
হর জগতের বিরহ আঁধার
দাওগো অমৃতি দীক্ষা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মননে ও ভাবনায়, চেতনায় ও দর্শনে বুদ্ধের অনন্ত প্রভাব নিরন্তর কার্যকরী রয়েছে। বুদ্ধের মহানুভবতা, বৌদ্ধযুগের মহৎ ঘটনাবলী, বহির্ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণতা ও বিস্ময়কর প্রকাশ কবির কাব্যে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে বুদ্ধ যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নাই। কবি রচিত 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, মস্তক বিক্রয়, পূজারিণী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী প্রভৃতি কবিতায় বুদ্ধপ্রসঙ্গ দেখা যায়। 'মূল্য প্রাপ্তি' কবিতায় সুদাস মালি বলেছেন :

প্রভু আর কিছু নহে
চরণের ধূলি এক কণা।'

'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতায় কবি আহ্বান জানালেন :

'অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু
আয়ু কারো দান
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।

কবি-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯৪২) ওপরও বুদ্ধের প্রভাব অপরিসীম। 'নমো সমুদ্ধায়' নামে এক দীর্ঘ কবিতায় তিনি বুদ্ধ প্রশস্তি করেছেন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য ও কবিতায় বুদ্ধের ও বৌদ্ধধর্মের অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের অপার মহিমা, বৌদ্ধভারতের ভাস্বর দীপ্ত রূপ, বৌদ্ধ সম্রাট ও মহনীয় ব্যক্তিদের জীবন আখ্যানকে কেন্দ্র করে আধুনিক যুগেও অনেক কাব্য ও কবিতা রচিত হয়েছে এবং এখনও রচিত হয়ে চলেছে।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) 'ছোটর দাবী' কবিতাটিতে বুদ্ধপ্রসঙ্গ ও বৌদ্ধস্থান অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন :

ভুলতে পারিনি সারনাথ এবং নালন্দার সে ধ্বংসটিকে
মনে পড়ে বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হংসটিকে।

কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) সুদীর্ঘ কবিজীবনে বহুবার বুদ্ধের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন :

'এস তথাগত
পুনঃব্যথাহত ভারতের বোধিতরুর তলে
জরা পীড়া কারা মরণের ভয় দূর কর
প্রেম করুণা বলে।'

রূপসী বাংলার তন্ময় কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) পরিচয় তাঁর কবিতাতেই প্রকটিত। সচেতন ভাবেই তিনি কবিতায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন :

ধর্মাশোকের স্পষ্ট আকাশের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে নির্বাণে।

বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) বিভিন্ন কবিতায় করুণাঘন তথাগত মূর্ত হয়ে উঠেছেন। বুদ্ধকে তিনি দেখেছেন আত্মশক্তির উদ্বোধক রূপে :

এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি বুদ্ধবীর
আনো উলঙ্গ সত্য কৃপাণ, বিজলী ঝলক ন্যায়-অসির।

বার্মার বিখ্যাত সোয়েডা বুদ্ধমূর্তি অবলোকন করে পল্লীকবি জসীমউদ্দিন (১৯০৩-৭৬) লিখেছেন :

সেই স্রোতে গেছে গড়ায়ে গড়ায়ে রাজা ও রাজ্য কত
তুমি আছ স্থির পদ্মপত্রে কোমল কলিকা মত।

কবি নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯-১৯৭১) বুদ্ধ বিষয়ক বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন :

জাতিস্মরের জাতকের কথা চাতকের মতো শুনি
বিস্ময় জাগে, মাটির মানুষ কিসের হয় এত গুণী?

কল্লোলযুগের শক্তিশালী কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-৮৮) একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর (১৯০৯-৯৫) কাছে বর্তমান ক্রূর পৃথিবীর নিষ্ঠুর আচরণ অসহনীয় বোধ হয়েছে। 'বুদ্ধের শরণ লইলাম' কবিতায় কবির প্রার্থনা—

দু'হাজার বছরের আগে
ধরণীর পূর্বভাগে
ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল আশ্চর্য যে নাম
আজও পৃথ্বী পিছু ফিরে
তাঁর কাছে নতশিরে,
কহিবে শরণ লইলাম।

অবতার প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪- ২০০২) বলেছেন, বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশ অবতারের এক অবতার বলে যে স্থান নির্দেশ করা হয়, তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন তিনি সব মানুষের চেয়ে তো বটেই, সব দেবতার চেয়েও বড়ো। 'বুদ্ধমহিমা' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

বুদ্ধের মহিমা ছিল একদা এ দেশে
মূর্তির ভগ্নাংশ দেখি পথে তরুতলে
লোকে পূজা করে নানা দেবতার বেশে
চিনতে পারে না আর তাঁকে বুদ্ধ বলে।

একমাত্র কবিই পারেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনাগত দিনের ছবি আঁকতে। ভারতে বর্তমানে সুপরিচিত কবিদের অনেকেরই বুদ্ধ বিষয়ক কবিতার মধ্যে ভাব তন্ময়তার অপরূপত্ব লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (বুদ্ধের স্মৃতিতে), অরুণ মিত্র (তথাগত), শঙ্খ ঘোষ (কখনও বা মনে হয়), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বুদ্ধ পূর্ণিমার রাত্রে), রাম বসু (কেন এ বোধ), কৃষ্ণ ধর (পূর্ণ পুণ্যের প্রতি), পুর্ণেন্দু পত্রী (বুদ্ধের নিকটে প্রার্থনা), অমিতাভ দাশগুপ্ত (বুদ্ধের আহ্বানে), তারাপদ রায় (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি), সুগত বড়ুয়া (বুদ্ধের প্রতিচ্ছবিতে), তরুণ সান্যাল (আবহমান) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীর পৃথকতায় বুদ্ধকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখার সৌভাগ্য পাঠকের হবে।

এইভাবে বাংলাভাষা তার বহমানতার স্রোতে বার বার জারিত হয়েছে বুদ্ধের দর্শন, মনন ও চিন্তার ঐশ্বর্যে। তাই আত্মদীপ জ্বালাতে কবি জয় গোস্বামীকে বুদ্ধের স্মরণ নিতে হয় :

আত্মদীপ কুঞ্জবনময়
রাত্রিপথ কোন সূত্র খোঁজে
পথের পরে পথে দস্যুভয়
ঘরের লোকে বোঝে?

বাংলাদেশেও কবিতায় বুদ্ধচর্চার ধারা সমানভাবে প্রবাহমান। সংগ্রামী কণ্ঠ সুফিয়া কামাল (১৯১১-২০০১) 'সিদ্ধার্থ' কবিতায় লিখেছেন—

মানুষ মানুষ হোক, অন্ত্যজ অশুচি কেহ নয়
ভিক্ষাপাত্র ভরে ওঠে, মন ভরে বুদ্ধের অভয়।

সুকবি শামসুর রহমানের (১৯২৯-২০০৬) 'হৃদয় কপিলবাস্তু' 'কী এক তৃষ্ণায় জ্বলে' বুদ্ধ বিষয়ক সুপরিচিত কবিতা। সমসাময়িক দুটি ঘটনা কবিচিত্তকে ব্যথিত করেছে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালিবানরা ধ্বংস করল শিল্প ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি রাষ্ট্রশক্তির সদম্ভ ঘোষণায় আর প্রত্যক্ষ পরিচালনায়। সেই অশুভ সময়ে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হলো প্রতিবাদের নানা সুর।

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া লিখলেন 'ওরা মানুষ নয়' :

সভ্য জগতে এ কোন কর্ম
শিল্পকে করে ভয়
ঐতিহাসিক কীর্তিবিনাশী
ওরা যে মানুষ নয়।
গুণী সাধকের শিল্পকর্ম
সহ্য করো না এ কোন ধর্ম
সহসা হিংস্র হয়
ওরা যে মানুষ নয়।

স্মরণ করি বিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যশস্বী, ক্রান্তদর্শী ছান্দসিক আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের (১৮৯৭-১৯৮৬) কথা :

ভারতবর্ষে আজ বড়োই দুর্দিন। যে ভারতবর্ষ একদিন বুদ্ধদেবের আদর্শকে আশ্রয় করে বিশ্বজগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মৈত্রী ও শান্তির বাণী বহন করে নিয়েছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে অবজ্ঞাত ও অবমানিত। ভারতবর্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যাকুলচিত্তে বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করে বলেছেন—

ওই নামে একদিন ধন্য হলো দেশে দেশান্তর
তব জন্মভূমি।
সেই নামে আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান কর তুমি।

(লেখক বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলকাতার সাধারণ সম্পাদক)
(সংক্ষেপিত)

অসীমানন্দের বিরুদ্ধে বানানো অভিযোগ আদালতে ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মক্কা মসজিদ মামলায় স্বামী অসীমানন্দের বিরুদ্ধে ন্যূনতম প্রমাণটুকুও দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে সিবিআই। অসীমানন্দের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের অন্যতম অভিযোগ ছিল, জেলবন্দি থাকার সময় তিনি অপর এক কয়েদি শেখ আবদুল কলিমের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। এছাড়াও, অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অপরাধ স্বীকার করেছেন বলে

সিবিআই যে দাবি করেছিল, তার পক্ষেও কোনও তথ্য-প্রমাণ তারা দিতে পারেনি। কত তারিখে, কোন সময়ে অসীমানন্দ এইরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন— তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে সিবিআই। এছাড়াও, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক দেবেন্দ্র গুপ্তা সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার যে অভিযোগ সিবিআই এনেছিল, এন আই এ-র বিশেষ আদালতের বিচারপতি রবিন্দ্র রেড্ডি, তাঁর রায়ে বলেছেন— এক্ষেত্রেও সিবিআই নিজের বক্তব্যের সপক্ষে কোনও যুক্তি বা তথ্য দেখাতে পারেনি। উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবেই এন আই এ-র বিশেষ আদালত সম্প্রতি মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ মামলায় অসীমানন্দ-সহ অন্য অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস দিয়েছে।

মক্কা মসজিদ মামলায় আদালতে দায়ের করা চার্জশিটে সিবিআই দাবি করেছিল, দিল্লির তিস হাজারি কোর্টে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং চঞ্চলগুড়া কারাগারে শেখ আবদুল কলিমের সামনে অসীমানন্দ অপরাধ কবুল করেছিলেন। অসীমানন্দের বিরুদ্ধে মূলত এটাকেই হাতিয়ার করেছিল সিবিআই। সিবিআইয়ের বক্তব্য ছিল, চঞ্চলগুড়া কারাগারে অসীমানন্দ যখন আটক ছিলেন, তখন ওখানে একই সময় বন্দি ছিলেন শেখ আবদুল কলিম। ওই সময়ই কারাগারে কলিম রোজ অসীমানন্দকে খাবার পরিবেশন করতেন। অসীমানন্দ কলিমের কাছ থেকেই জানতে পারেন, এই মক্কা মসজিদ কাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে কলিমকে আগে একবার পুলিশ ধরেছিল। সিবিআইয়ের বক্তব্য, কলিমের সঙ্গে কথা বলার পর অসীমানন্দ অনুতপ্ত হন এবং স্বীকার করেন মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণের ঘটনায় তিনি জড়িত ছিলেন।

কিন্তু সিবিআইয়ের এই গালগল্প একেবারেই ধোপে টেঁকেনি আদালতে। তাঁর ১২১ পাতার রায়ে বিচারপতি রেড্ডি বলেছেন, চঞ্চলগুড়া কারাগারে অসীমানন্দ, কলিম এবং অপর এক যুবক মকবুল বিন আলি যে একই সময়ে বন্দি ছিলেন— সেরকম কোনও তথ্য আদালতে দিতে পারেনি সিবিআই। মুখের কথা ছাড়া কোনও তথ্য প্রমাণই সিবিআইয়ের কাছে নেই। এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার চঞ্চলগুড়ার তৎকালীন পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাননি অসীমানন্দের সঙ্গে ওই সময়ে কলিমও এই কারাগারে বন্দি ছিলেন কিনা। এ ব্যাপারে এসপির সঙ্গে কথা বলে তা নথিভুক্ত করা যেতে পারত। কিন্তু সে চেষ্টাও সিবিআই করেনি। আদালত তাঁর রায়ে স্পষ্ট জানিয়েছে, কলিম এবং মকবুল আলি অসীমানন্দের সঙ্গে একই সময়ে কারাগারে ছিল কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। ফলে, তারা আদৌ সত্য কথা বলছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ থেকে যায়।

সিবিআইয়ের তদন্তের ধরন-ধারণ নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে আদালত। আদালত বলেছে, তদন্তকারী অফিসার কেন তাড়াহুড়ো করে দিল্লি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অসীমানন্দের স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন— তাও পরিষ্কার নয়। স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করানো হলে তদন্তকারী অফিসার তো হায়দরাবাদে এসে অসীমানন্দের পুলিশ হেপাজতের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর আদালতের দ্বারস্থ হতে পারতেন। দিল্লিতে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অসীমানন্দকে যে কোনও আইনি সহায়তা দেওয়া হয়নি তাও এন আই এ আদালতের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে এন আই এ আদালতের মনে হয়েছে, অসীমনন্দের দাখিল করা স্বীকারনামা বলে সিবিআই যা দাবি করছে, তা স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি নয় বলেই মনে হচ্ছে।

আর এস এসের প্রচারক দেবেন্দ্র গুপ্তার বিরুদ্ধে সিবিআই অভিযোগ এনেছিল, ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ায় ভাষণ দিতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়েছেন তিনি। এন আই এ আদালত বলেছে— একজন সাব ইন্সপেক্টরের মৌখিক বক্তব্য ছাড়া এ ব্যাপারে কোনও তথ্য প্রমাণই দিতে পারেনি সিবিআই। বরং সিবিআইকে ভর্ৎসনা করে আদালত বলেছে, 'আর এস এস কোনও নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। কাজেই আর এস এসের সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলেই তিনি সাম্প্রদায়িক— এমন মনে করার কোনও কারণ নেই।'

আদালতের রায় বিরূপ হলে রামমন্দিরে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি

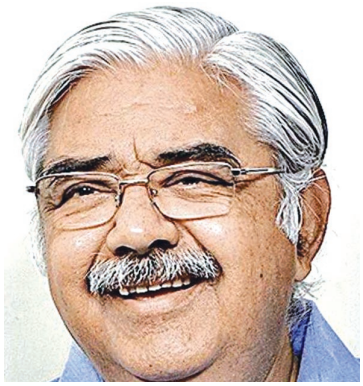

অলোক কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাম জন্মভূমি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যদি বিরূপ রায় দেয়, তাহলে কেন্দ্র সরকারের উচিত হবে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা। বলেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার। অলোক কুমার পরিষ্কার বলেছেন, 'রামমন্দির শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমিতেই গড়ে উঠবে। অন্য কোথাও নয়।'

রামমন্দির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি বলেন, 'দেশের সর্বোচ্চ আদালত কী রায় দেয় তার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। আমরা আশা করছি, সুপ্রিম কোর্টের রায় আমাদের পক্ষেই যাবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এটাকে যেহেতু নিছক একটি জমি সংক্রান্ত মামলা হিসাবে দেখছে, সেক্ষেত্রে তার রায় যদি বিপক্ষে যায়— তাহলে সরকারি হস্তক্ষেপ আমরা দাবি করব।' অলোক কুমার বলেন, 'সংসদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এই জমিটি সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দান করার।' তাঁর দাবি, 'ওই জমিতে কেন রামমন্দির গড়া হবে— তার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি এবং তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। সেজন্যই বলছি, আমরা মামলায় জিতব বলেই আশা প্রকাশ করছি। তবুও যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে দেশের মানুষই সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে বলবে।'

সম্প্রতি তপশিলি জাতি-উপজাতি আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে অলোক কুমার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের এই রায় তপশিলিদের ভিতর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। আমার ব্যক্তিগত মত হলো, এই আইনটিকে লঘু না করাই ভালো। তবে, আমি খুশি হয়েছি যে, সরকার বিষয়টির পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছে।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অলোক কুমার বলেন, '১৯৬৪ সাল থেকে সামাজিক ন্যায়, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে আমরা কাজ করে আসছি। এক এক সময়ে এক একটা কাজের গুরুত্ব বেড়েছে। এই সময় আমাদের সামনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামাজিক একতা সুদৃঢ় করা। উন্নাও এবং কাসগঞ্জের মতো ঘটনা যে এখনও ঘটে সেটাই তো সব থেকে দুঃখের।'

অলোক কুমার বলেন, 'শুধু সামাজিক ভোজ বা অষ্টমী পুজোর দিন তপশিলি জাতির কন্যাকে পুজো করে সামাজিক বৈষম্য ঘোচানো যাবে না। তিরিশের দশকে হয়তো এগুলি সবিশেষ জরুরি ছিল। কিন্তু এখন আরও অনেক কাজ করতে হবে। প্রথম কাজ হচ্ছে, তপশিলি জাতি-উপজাতিদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। ফলে সংরক্ষণ এখনও দরকার এবং সংরক্ষণ থাকবেই।'

কংগ্রেসের প্রতি কটাক্ষ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি বলেন, 'কোনও কোনও দল এখন বুঝতে পারছে যে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু তোষণ করে তারা আর ভোটে জিততে পারবে না। কাজেই তারা ঠিক করেছে তাদের নেতারা এখন মন্দিরে যাবেন এবং নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবেন। এদের নেতারা এখন বলছেন, হিন্দুধর্ম ভালো, কিন্তু হিন্দুত্ব খারাপ। এটাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।'

প্রবীণ তোগাড়িয়ার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অলোক কুমার। তিনি দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন কার্যকর্তা। এছাড়া, চলচ্চিত্র বিষয়ক সংগঠন ভারতীয় চিত্র সাধনার চেয়ারম্যান।

প্রধান বিচারপতিকে অপসারণের হীন কৌশলে ব্যর্থ কংগ্রেস

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।। সর্বোচ্চ আদালতে বহু আলোচিত ন্যায়াধীশ বি এইচ লোয়া মামলার রায় বেরোনর পর প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট মোশান এনে কংগ্রেস তার দলীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা হীন কাজ করল। কিছুদিন থেকেই লোয়া মামলায় রায় যাতে তাদের পক্ষে গিয়ে দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সহায় হয় তা নিশ্চিত করতে তারা এই মোশান আনার হুমকি জারি রেখেছিল। ঠিক যে মুহূর্তে প্রধান বিচারপতির রায় তাদের আশানুরূপ হলো না, তখনই তারা কালবিলম্ব না করে পাল্টা এই অযাচিত ইমপিচমেন্ট নিয়ে এল। শুধু লোয়া মামলা নয়, কংগ্রেসের এই নীচ মতলবের পেছনে বাবরি মসজিদ মামলার শুনানিকে যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা যায় সেই উদ্দেশ্যও রয়েছে। ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ আদালতকে নিজেদের খুশি মতো পরিচালিত করতে উকিল-রাজনীতিক কপিল সিব্বাল বাবরি মামলার শুনানিকে ২০১৯ সালের নির্বাচন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যও দেখিয়েছিলেন।

প্রথমেই বলা দরকার, এই মোশান নিয়ে আসাটা অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত কেননা এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগের ওপর আনীত। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মহামান্য প্রধান বিচারপতিকে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ের জন্য সমস্ত মামলা থেকে হাত গুটিয়ে অকর্মণ্য করে রাখা, আইনের ভাষায় এর নাম 'Recuse'। কংগ্রেস খুব ভালো করেই জানে যে কোনও তদন্তই বিচারপতির অবসর নেওয়ার আগে শেষ হবে না। সংসদেও যে তারা সংখ্যার হিসেবে পাত্তা পাবে না এও তাদের অজানা নয়। তাই এটিকে কখনই ইমপিচমেন্ট মোশান বলা যাবে না, এটি আদতে প্রধান বিচারপতি যদি আগামী দিনে তাদের পক্ষে দুষ্পাচ্য কোনও রায় দিয়ে দেন সেই কাজ থেকে তাকে সরিয়ে অকর্মণ্য করে রাখা। অর্থাৎ 'Recusal

দীপক মিশ্র

Motion'-কে ভিরস্বামী মামলার (১৯৯১, ৩ এসসিসি ৬৫৫) রায়ের ভিত্তিতে কংগ্রেস প্রধান বিচারপতিকে বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকার আবেদন করার কৌশল করছে। এটা ঠিকই উল্লেখিত মামলায় তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি অভিযুক্ত বিচারপতিকে তাঁর বিরুদ্ধে নিযুক্ত তদন্ত কমিটির কাজ চলাকালীন দৈনন্দিন কাজ থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছিলেন। কিন্তু সেই আদেশ কোনও রুটিন আদেশ ছিল না। প্রধান বিচারপতি নির্ভর করেছিলেন সপ্রমাণ অভিযোগগুলির গুরুত্বে।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সমস্ত অভিযোগই মিথ্যে। এই বালখিল্যপনা যে কতদূর এগিয়েছে তা বোঝা যায় যখন জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে একটি মামলায় প্রধান বিচারপতিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যখন তিনি এমনকি হাইকোর্টের বিচারপতি পর্যন্ত হননি। এখানে ভুললে চলবে না তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ১৯৯৬ সালে তাঁকে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে প্রথম নিয়োগ করেছিল। এরপর ২০০৯ সালের ডিসেম্বর তাঁকে তারাই পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করে। আবার ২০১০ সালে মে মাসে দিল্লি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগও কংগ্রেসই করেছিল। সর্বোপরি ২০১১ সালের ১০ অক্টোবর এই কংগ্রেসের মহারথীরাই বিচারপতি দীপক মিশ্রকে সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করে। এ থেকে যে কারুরই বোঝা উচিত যে কংগ্রেস দল তাদের আনা আজকের বিভিন্ন অভিযোগকে তখন ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। তারা এগুলিকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি। দু'টি অন্য অভিযোগ রয়েছে আদালতের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম পরিচালনা ও বিধিধ মামলার বিচারপতিদের মধ্যে বণ্টন নিয়ে। এক্ষেত্রে বিচারপতি জে চেলমেশ্বর ও অন্য তিনজনের বিতর্কিত সাংবাদিক সম্মেলনকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের বক্তব্যকেই প্রমাণ বলে ধরা হয়েছে। এছাড়া আর একটি বহু পুরনো এক মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত রায় নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। এটিরও তিলমাত্র সারবত্তা নেই। তাই উপরিউক্ত অলীক অভিযোগগুলির ভিত্তিতে নৈতিক মানদণ্ডে কোনও Recusal অর্থাৎ বিচারপতিকে সাময়িক বসিয়ে দেওয়া যায় না। নিয়মানুসারে একজন বিচারপতিকে তাঁর প্রথামাফিক নিয়োগের পর সংসদে তাঁর বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেন্ট মোশান গৃহীত না হওয়া বা তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনও তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্তে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আদালতের নির্দিষ্ট সমস্ত রকম কাজকর্ম নির্বাহ করার পূর্ণ অধিকার আছে।

সংবিধান অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও বিচারপতিকে সাসপেন্ড করা যায় না। একজন বিচারপতি কোনও সাধারণ সরকারি কর্মচারী নন। ঠিক এই কারণেই সংবিধানের ১২৪নং ধারায় এই মর্মে কোনও বিধান রাখা হয়নি কেননা তা হলেই যে কোনও রাজনৈতিক দল বিচারপতিদের ব্ল্যাকমেল শুরু করতে পারত। একই ভাবে কোনও মোশান অব ইমপিচমেন্ট গৃহীত হলেও সংবিধানে তাঁকে কাজ থেকে বিরত রাখার কোনও বিধান নেই। এটি নিছকই একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অবমাননা করার ধৃষ্টতা।

তথ্য সূত্র :সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী-র নিবন্ধ)।

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ৮

তারপর কুরু-পাণ্ডব দুই পক্ষের মহাভারতের সেই মহাযুদ্ধ।
যে যুদ্ধে ভারতের সব নৃপতিই কোনো না কোনো পক্ষে যোগ দেন।

অভিমন্যু একথা শোনার পর ভীষ্মের মুখোমুখি হল।

যুদ্ধের প্রথমদিন থেকেই অভিমন্যু ছিল সেরা একজন।

ক্রমশঃ

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

৩০ এপ্রিল (সোমবার) থেকে ৬ মে (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি, বৃষে শুক্র, কর্কটে রাহু, তুলায় চন্দ্র ও বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে মঙ্গল ও বক্রী শনি, মকরে কেতু এবং মীনে বুধ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় মকরে মঙ্গলের প্রবেশ।

রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্রের অবস্থান তুলনায় স্বাতী থেকে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে।

মেষ : বিশেষ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীর শরীরের কারণে ব্যয়।
শিল্পী-সাহিত্যিক-বিদ্বজ্জনের প্রতিভার প্রকাশ। জ্ঞান ও বুদ্ধির কারণে সুনাম, আর্থিক শুভ। কথাবার্তায় সতর্ক থাকা দরকার, মিত্রস্থান হিতকারী নয়। স্ত্রীর নতুন কর্মযোগ, সুখাদ্য ও বিলাস-ব্যসনে মানসিক তৃপ্তি।

বৃষ : উত্তরাধিকার অথবা লটারিতে প্রাপ্তি। প্রণয়ঘটিত জটিলতা, গৃহে গুণীজনের শুভাগমন, কর্মসূত্রে ভ্রমণ। শারীরিক ক্লান্তি-অবসাদ। সন্তানের জেদের কারণে উদ্বেগ। গৃহসুখ, কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব ও শংসা প্রাপ্তি।

মিথুন : গৃহ ও মাতৃসুখ। দেব-দ্বিজে ভক্তি ও শুভানুষ্ঠান। পিতার ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, স্ত্রী ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। ইলেকট্রনিক্স ও পরিসংখ্যান বিদ্যায় শুভ। সন্তানের কোনও সংবাদ ও নতুন পরিকল্পনায় আনন্দ।

কর্কট : ভোজনে তৃপ্তি, বাহন যোগ, নতুন ব্যবসার বাস্তবায়ন। পরিবারে অসুস্থতায় উদ্বেগ, সামাজিক কাজে তৃপ্তি। সমালোচনা-বিরূপ মন্তব্য, স্থানান্তর। সন্তান-সন্ততি মনঃক্লেশের কারণ হলেও গুরুজনের কৃপাদৃষ্টি। গৃহে পূজাপাঠ, উচ্চশিক্ষায় দূর গমন। প্রেস, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার কাজে শুভ।

সিংহ : সৃজনশীল কর্মে উৎসাহ, গুণীজনের কৃপালাভ। নিজ বুদ্ধিতে সমস্যার সমাধান, স্ত্রীর কর্মে পারিবারিক জটিলতা। গৃহ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুভ। তথ্যপ্রযুক্তি অটোমোবাইল কর্মে লাভবান। পরিবারে সদস্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সর্ববিষয়ে অনায়াস সাফল্য। স্ত্রীর নামে ব্যবসায় বিনিয়োগ শুভ।

কন্যা : দালালি-প্রমোটার ও ফাটকা ব্যবসায় শুভ। শরীর ও কর্ম বিড়ম্বনা, মিত্রস্থান হিতকারী নহে।
মামলা-মেকদ্দমায় অনুকুল। খেলাধূলা-শিল্পকলা-বুদ্ধিজীবীর পদক্ষেত্র ইতিবাচক। প্রেমে সাফল্য, ব্যবসায় শুভ।

তুলা : প্রেমে সাফল্য-প্রশান্তি। সামাজিক দায়িত্ব বৃদ্ধি, পরিবহণ ও খনিজ ব্যবসায় শুভ। লিখিত কোনও বিষয়ে নেতিবাচক ফল।
গাড়ি-বাড়ি-নতুন পোশাক, সুখাদ্য, আড়ম্বর, অনুষ্ঠান।

বৃশ্চিক : বসন্তরোগ ও কীট-পতঙ্গ বিষয়ে সতর্কতা। বাহন ক্রয়ে গুরুজনের সম্মতি। প্রতিযোগিতামূলক ও সৃজনশীল কর্মে সাফল্য। গুণীজনের সান্নিধ্য, তবে নারীঘটিত ঝামেলা। স্ত্রীর নতুন ব্যবসায়, বিনিয়োগ, শ্রীবৃদ্ধি, গোপনীয়তা বজায় রাখুন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা।

ধনু : প্রেমজ সম্পর্কে উৎসাহ, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের শুভ। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রা, সপ্রসন্ন ভাগ্য। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত ও কথাবার্তায় সতর্ক থাকা দরকার। স্ত্রী অথবা প্রেমিকের জন্য ব্যয়, অতিথি সমাগম, সুপরামর্শ কার্যকরী হওয়ায় পারিবারিক শান্তি। বুদ্ধির সাফল্য, শংসা।

মকর : ভোজন-ব্যসনে তৃপ্তি, প্রতিবেশী-মাতৃস্থানীয় ও সন্তানের শুভ। বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বয়োজ্যেষ্ঠর ঐকান্তিকতায় উদ্বেগ, ব্যয়। জ্ঞান-বুদ্ধির স্ফুরণ, সুপরামর্শের মান্যতা। গবেষণা ও সৃজনশীলকর্মে মিত্রস্থানীয়ের বাধা।

কুম্ভ : কর্মসূত্রে ভ্রমণ, প্রাপ্তি অধরা থাকবে। শরীর অসংযমের কারণে পারিবারিক অস্বস্তি। কর্মচ্যুতি অথবা কর্মপরিবর্তন যোগ। গুরুজনের পরামর্শে গৃহে শান্তি। বিদ্যার্থীর ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা।

মীন : দাম্পত্য সম্পর্কে মান-অভিমানের পালা। সামাজিক দায়িত্ব পালনে তৃপ্তি। মহিলাদের জেদ ও মেজাজিভাব এড়িয়ে চলুন। গৃহ/জমি সংক্রান্ত বিবাদের অবসান, ভ্রমণ। শান্ত ও সংযত থাকুন। রক্ষণশীল হওয়া তুলনামূলক শুভ। একাধিক উপায়ে প্রাপ্তি, প্রফুল্ল মন।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য